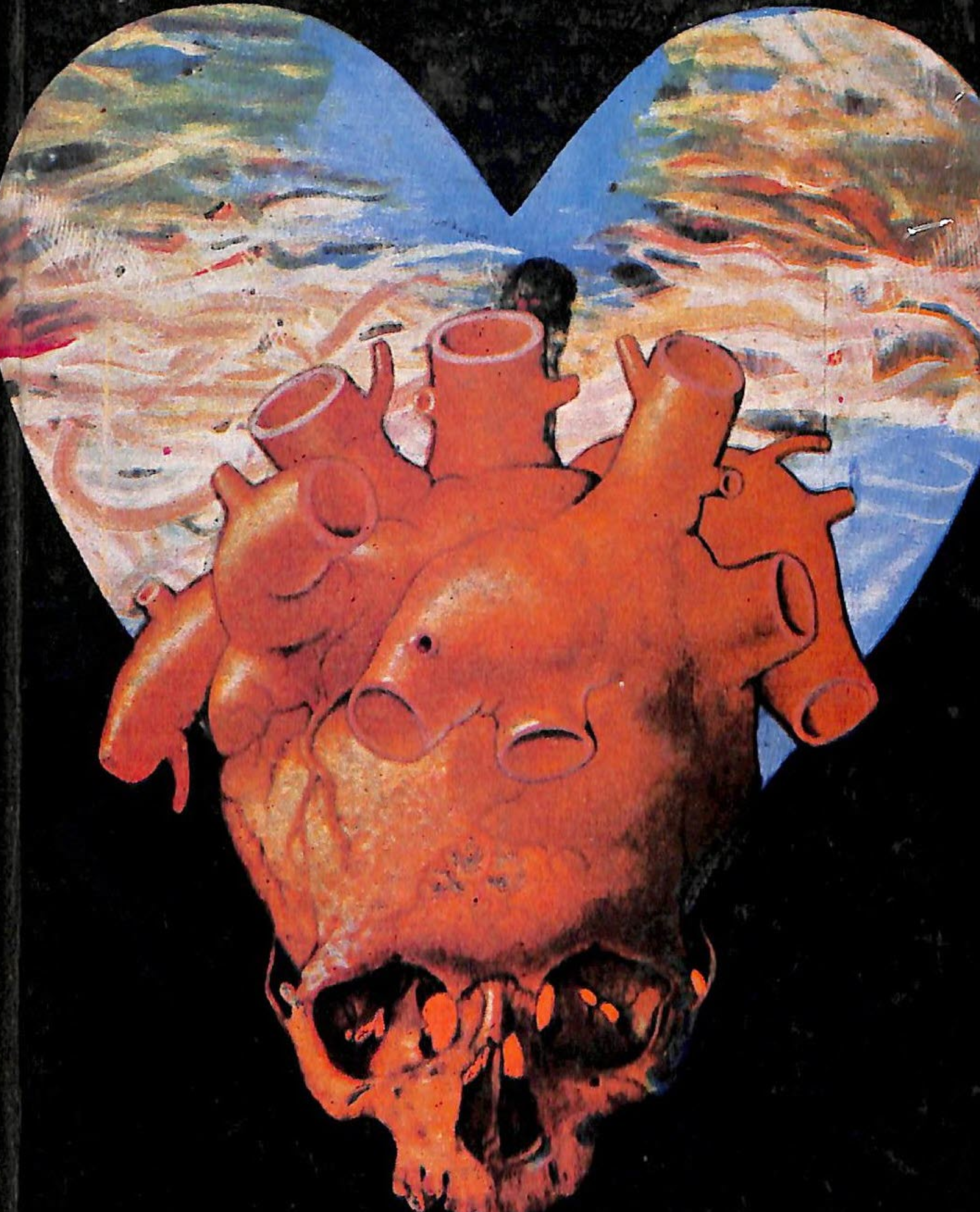
হার্ট নিয়ে একডজন



সুভাষ সান্যাল

হার্ট নিয়ে একডজন

সুভাষ সান্যাল

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

প্রচ্ছদ ঃ অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ঃ ১০·০০ টাকা

মুদ্রক ঃ
শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য্য
জোনাকি প্রেস
৭৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

হার্ট নিয়ে যত ভয়, যত ভাবনা, তার অনেকটা অজানা বলেই। জানলে, ভয়ভাবনা কমে, আশঙ্কাকে এড়িয়ে থাকা যায়। সেই জানানোর প্রচেষ্টা রয়েছে বইটিতে।

লেখকের কথা

কথায় বলে—শরীর ব্যাধির মন্দির। শরীর থাকলে অসুখও থাকবে। হাল আমলের সমীক্ষাগুলো বলছে সারা দুনিয়ায় যত মানুষ অসুখে ভুগে মারা যান প্রতিবছর, তার সিংহ ভাগটাই পড়ে হার্ট, রক্তচাপ ও সেই সংক্রান্ত নানা অসুখের শিরোনামায়। কয়েকবছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় জানা গেছে ওদেশে প্রতি বছর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এই ধরনের উপসর্গের শিকার হন, ফি-বছর এতে মারা যান অন্ততঃ ষাট হাজার জন! শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান যদি এই হয়, সারা দুনিয়ার হিসেবে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—ভাবতেও ভয় হয়।

১৯৮০-র শেষের দিকে, ছোটদের জন্য মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান-মেলা'র তরফে সম্পাদক, আমাকে অনুরোধ করেন পত্রিকার 'শরীর-স্বাস্থ্য' বিভাগটির দায়িত্ব নিতে। উদ্দেশ্য—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মের সঙ্গে কিশোর পাঠক পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রথম কিস্তির লেখা শুরু হয়েছিলো হার্ট নিয়ে। ইচ্ছে ছিলো পরের সংখ্যায় অন্য কিছু নিয়ে লেখার। অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে এবং পত্রিকা সম্পাদকের নির্দেশে হার্ট নিয়ে অন্ততঃ দু-ডজন লেখা লিখতে হয়েছিলো ১৯৮১ থেকে '৮৩—এই তিনবছর সময়ে। তারই অংশবিশেষের পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে লেখা হলো 'হার্ট নিয়ে একডজন'। এ কাজে বন্ধুবর সুভাষ দাস ও সাধন দাশগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায় নেই।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—বিজ্ঞানের বই, তাতে গল্পের ঢং-এর অবতারণা কেন? কেনই বা ইংরেজী শব্দের এত ছড়াছড়ি? সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে—বিজ্ঞান অনেকটা তেতো ওষুধের মতো। তেতো ওষুধের ওপর যেমন ক্যাপসুলের মোড়ক দেওয়াই নিরাপদ, তেমনি বিজ্ঞানকে গল্প, কথোপকথনের বা ঐ রকম কোনো মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করলেই বোধহয় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোয় চট্‌পট্—বিশেষতঃ পাঠক-পাঠিকা যদি বয়সে নবীন হয়। এ বই আগাগোড়া কথ্যভাষার ঢং-এ লেখার চেষ্টা করেছি, প্রচলিত মুখের ভাষায় এখন বাংলা আর ইংরাজী মেশামেশি, এখানেও তাই সেটা পাল্টানোর চেষ্টা করিনি।

এ বই-এর প্রধান দুটি চরিত্র দুই ভাইবোন—গাবলু আর টুম্পা। তাদের রোজকার জীবনে নানা অভিজ্ঞতা আর প্রশ্নের কাঠামোয় রঙতুলি বুলিয়েছে সদ্য পাশ করা ডাক্তার—ছোটমামা। ছোটমামার গল্প গাবলু-টুম্পা কতটা বুঝতে পারলো তা জানার জন্যেই বোধহয় কথার ফাঁকে ফাঁকে সত্যবাবু

এসেছেন। এই চারজন—নিজেদের ভূমিকা কে কতটা পালন করলেন, সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের।

সবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, হার্টের মতো জটিল বিষয়, কিশোর-কিশোরীদের কাছে অবতারণা করার দরকারটা ছিলো কি? বোধহয় ছিল। যদিও বলা হয়, হার্টের অসুখের সূত্রপাত মোটামুটিভাবে চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে, তবু আজ এটা প্রমাণিত হয়েছে রোগের প্রথম সূত্রপাত ঘটে আরো দশ কি পনেরো বছর আগে, চল্লিশের পর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র! ত্রিশ-বছরে যে গন্ডগোলের সূত্রপাত, তা কিন্তু আবার একদিনে আসে না, রোজকার জীবনে নানা খুঁটিনাটি অভ্যেস, খাওয়াদাওয়া, জীবনযাপনের ধারা, মানসিক উদ্বেগ, সব কিছুই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ছোট বয়স থেকেই যদি কারণগুলো সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হওয়া যায়, আখেরে তাতে লোকসান নেই, বরং লাভই আছে।

এছাড়া ধন্যবাদ জানাই মন্ডল এ্যান্ড সন্সের শ্রীশংকর মন্ডলকে, যাঁর সক্রিয় সহযোগীতা ছাড়া এ বই পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়াই সম্ভব হতো না।

এই বই যদি সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক-পাঠিকাদের সামান্যতম কোন সাহায্য করতে পারে, তবেই এ লেখা সার্থক হবে।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

কলকাতা

● ডঃ সুভাষ সান্যাল

উৎসর্গ

বাবা ও মা'কে



একটি গোলমেলে প্রশ্ন !

দিনে লাখোবার !

ছোটমামা বললো—সঠিক হিসেবটা যদিও আর একটু বেশী, তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে তোর বুকের ভেতর যে জিনিসটা ধুক্‌পুক্‌ করছে তার নড়াচড়ার হিসেব হলো ঐ।

বাজে কথা, তুমি কি সারাদিন বসে গুনেছো ?—পাল্টা প্রশ্ন এলো গাবলুর দিক থেকে।

বিশ্বাস হচ্ছে না তো ?—খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখলো ছোটমামা ঃ হাতে-নাতে বরং মেপে ফেলা যাক্‌। ধর্‌—তুই আমার হাতের কব্জির কাছটা ধর্‌। না না, অতো জোরে না, যে পাশে বুড়ো আঙ্গুলটা আছে তার নীচ বরাবর তিন আঙ্গুল দিয়ে কব্জিটা আলতো করে ধর্‌। কি ? এবার একটা কিছু দপ্‌দপ্‌ করছে ? ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে এক মিনিটে কতবার দপ্‌দপানির আওয়াজ পাচ্ছিস গুণে ফেল্‌ তো ? কি ? কতো হলো ?

চুয়াত্তর-পঁচাত্তর বার মনে হলো যেন।—মাথা ঝাঁকালো গাবলু।

বেশ, এবার ঐ পঁচাত্তরকে ষাট দিয়ে গুণ করে তাকে আবার চব্বিশ দিয়ে গুণ কর্‌তো, দেখ্‌ দেখি, হিসেবে মেলে কি না !—মুখ টিপে হাসলো ছোটমামা ঃ অবশ্য তোর বেলা মিলবে কি না বলতে পারছি না। সারাদিন যে দৌড় ঝাঁপ করিস্‌ ! প্রায়ই তোর নাড়ীর গতি একশো ছাড়ায়।

আচ্ছা ছোটমামা, হার্টটা চলছে বুকের ভেতর কিন্তু হাতে তার আওয়াজ পেলাম কেন ?—গাবলুর মুখ দেখে মনে হলো বেচারা বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছে।

এমন সময় পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো টুম্পা, গাবলুর দিদি—একমাত্র দিদিও বটে। টুম্পা এখন বড়ো হয়ে গেছে, এবার ক্লাস টেনে উঠবে। টুম্পা বললো —এ আবার এমন কি প্রশ্ন রে ? এসব আমরা তো বইয়ে পড়েছি। হার্ট পাম্প করছে বলেই রক্ত যাচ্ছে রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে। এর যে ধাক্কা দেওয়ালে লাগছে, তাতেই দেওয়ালটা পাশের দিকে একটু সরছে, আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসছে, ঠিক ঢেউয়ের মতো। তাই না ছোটমামা ?

একেবারে ফুলমার্কস।—ছোটমামার জবাব।

টুম্পা কিন্তু অতো সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

—আচ্ছা ছোটমামা, তুমি তো দিনরাত ডাক্তারির মোটা মোটা বই পড়ছো। একটা কথা বলো দেখি? খানিকক্ষণ কোন কাজ করার পর আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। অথচ হৃদ্‌পিণ্ডের বেলায় দেখ, দিনে একলাখ বার ধুক্‌পুক্‌ করেও একটু ক্লান্ত হয় না! এটা একটু বুঝিয়ে বলো দেখি?

ছোটমামা বললো—বেশ শক্ত প্রশ্ন করেছিস! একটু ভেবে গুছিয়ে জবাব দিতে হবে। তোর মাকে বরং একটু চায়ের কথা বলে আয় গাবলু।

—এটা তো জানিস, জন্মাবার আগে থেকেই আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড কাজ করতে শুরু করে?

মানে?—চোখ গোল গোল করে প্রশ্ন করে টুম্পা।

—মানে মায়ের পেটে আমাদের বয়স যখন মাত্র আঠারো দিন, তখন থেকেই ওর কাজ শুরু। মজার ব্যাপারটা কি জানিস? তখনো কিন্তু শরীরে রক্ত তৈরী হয় নি। আর রক্ত তৈরী হবেই বা কি করে, শরীর বলতে তো তখন স্রেফ্ ছোট্ট সুপুরীর মতো মাংসপিণ্ড। তার ভেতরে যেটুকু জল ধারণের জিনিস আছে, তাকেই ঐ সুপুরীর মধ্যেকার এলাচদানার মতো হার্ট পাম্প করে চলেছে।

ক্রমে দিন যেতে থাকে, হার্টটাও তৈরী হয়ে যায়, জন্মাবার আগে ওটা মিনিটে প্রায় দেড়শোবার করে রক্ত পাম্প করতে থাকে। এরপর, অর্থাৎ জন্মাবার পর এই হার্ট-রেট কমতে থাকে। শেষমেষ মিনিটে সত্তর পঁচাত্তর বার যখন এই ধুক্‌পুকুনি এসে পেঁছোয়, তখন আর সেটা কমে না।

ভেতর থেকে ঘুরে এসে ছোটমামার কথা শুনছিল গাবলু। ছোটমামা থামতেই জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, এই যে হৃদ্‌পিণ্ড চলছে, তারজন্য শক্তি খরচ হচ্ছে না?

সে তো বটেই।—টুম্পার জবাব।

দাঁড়াও গাবলুবাবু। তোমায় একটা মজার হিসেব বলি।—মুচকি হাসলো ছোটমামা ঃ ধরু, একটা মানুষ বাঁচলো সত্তর বছর। সত্তর বছর ধরে হার্টটা চলতে যা শক্তি খরচা হচ্ছে, সেই শক্তিটা যদি জমা রাখা যেত, তাহলে তা দিয়ে একটা বড়োসড়ো মালগাড়ীকে হাজার পাঁচেক মিটার অর্থাৎ মাঝারি ধরণের একটা পাহাড়ের চুড়োয় তোলা যেত!

টুম্পা বললো—মামা, তুমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছ। আমার কথার উত্তর দিলে না।

ছোটমামা বললো—তাহলে বুঝতেই পারছিস হার্টকে কী প্রচণ্ড কাজ

করতে হচ্ছে সব সময়। কিন্তু এখানে একটা মজা আছে। হৃদ্‌পিণ্ড চলতে চলতেই বিশ্রাম নিয়ে নেয়। সেই জন্যই ক্লান্ত হয় না।

বুঝলাম না—হাত উল্টে দেয় টুম্পা।

তোরা তো জানিস্‌, হৃদ্‌পিণ্ডের চারটে কুঠুরী আছে।—ব'লে চলে ছোটমামা : ওপরের দুটো অলিন্দ বা অরিকল্‌, আর নীচের দুটো নিলয় বা ভেণ্ট্রিকল্‌। মজাটা হলো অলিন্দ আর নিলয় কিন্তু এক সাথে কাজ করে না। অলিন্দের কাজ হলো পাম্প করে রক্তকে নিলয়ে পাঠানো আর নিলয় সেই রক্ত পাঠাচ্ছে শরীরে বা ফুসফুসে।

অলিন্দে যখন সংকোচন হচ্ছে নিলয় তখন চুপ করে থাকে। আবার নিলয় যখন কাজ করে, অলিন্দের তখন বিশ্রাম নেবার পালা। সারা দিনের হিসেবে অলিন্দ দুটো কাজ করছে মাত্র সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা, বাকি বিশ ঘণ্টাই তাদের ছুটি। তুলনায় নিলয় কাজ করে বেশী, দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা, বাকি তেরো থেকে পনেরো ঘণ্টা বিশ্রাম। তাহলেই বুঝতে পারছিস হৃদ্‌পিণ্ড কেন পরিশ্রান্ত হয় না?

মা ভেতর থেকে টুম্পাকে ডাকলেন—মামার জন্য চা'টা নিয়ে যাও।

টুম্পা উঠে যেতেই গম্ভীরভাবে গাবলু বললো—আচ্ছা মামা, আমাদের পুষিটার হার্ট বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি চলে। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি বুকের মধ্যে ধুক্‌পুকুনি অনেক বেশী।

—একদম ঠিক দেখেছিস। বিল্লীদের স্বাভাবিক হার্ট রেট হচ্ছে মিনিটে দুশো চল্লিশবার। আবার যে প্রাণীর আকার যতো বড়ো, তার হার্ট চলবে ততো আস্তে।

—তাহলে হাতীর হার্ট নিশ্চয় খুব আস্তে চলে?

—সে তো বটেই!

—মিনিটে কতবার?

—এই ধর্‌, হাতীর ওজন তিন টন, হার্ট চলে মিনিটে ছেচল্লিশ বার। আবার সব থেকে বড় প্রাণী হলো তিমি, এটা নিশ্চয় জানিস? সেই তিমি, যার ওজন দেড়শো টন, তার হার্ট চলছে মিনিটে মাত্র সাতবার!

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে টুম্পা বললো—তাহলে পাখীদের হৃদ্‌পিণ্ড সব থেকে তাড়াতাড়ি পাম্প করে নিশ্চয়ই?

তাতো বটেই।—ছোটমামা বললো : ব্লু-টিট ব'লে এক ধরণের পাখী আছে, যাদের ওজন মাত্র আট-দশ গ্রাম। তাদের হার্ট মিনিটে বারোশো বার ক'রে রক্ত পাম্প করছে!

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ওজন কমলে হার্ট বিট বাড়ছে। কিন্তু এটা কেন?—চট করে প্রশ্ন ক'রে বসে টুম্পা।

চায়ের কাপে চুমুক দিলো ছোটমামা: উঁহু, ওজন নয়, বল্ আয়তন। যার চেহারা যত বড়োসড়ো, তার হার্ট চলবে ততো আস্তে। আসলে আমরা যাদের কথা বলছি, সকলেই উষ্ণ রক্তের প্রাণী তো?

অর্থাৎ যাদের রক্তের তাপমাত্রা শীত-গ্রীষ্মে একই রকম থাকে—সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে গাবলু।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে ছোটমামা।—হ্যাঁ, এ নিয়মটা শুধু তাদের বেলায় খাটবে। অর্থাৎ পাখী আর স্তন্যপায়ী জীব-জন্তুদের ক্ষেত্রে।

টুম্পা বললো—মানে তুমি বলছো সাপ-ব্যাঙেরা এ নিয়ম থেকে বাদ। কিন্তু এখানে রহস্যটা কি?

আরাম করে সোফায় গা এলিয়ে দিলো ছোটমামা।

—উত্তরটা কি ভেবেছিস্ সেটা আগে শুনি?

মাথা চুলকালো টুম্পা।

—আমার ধারণা শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার সঙ্গে এর বোধ হয় একটা সম্পর্ক আছে। হার্ট যত বেশী চলবে, রক্তও সারা শরীরে বেশী বার ছড়িয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে শরীর থেকে বেশী বেশী তাপ চামড়া দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। যার আয়তন যতো বেশী তার শরীর থেকে তাপও ততো বেশী বেরুনো উচিত, তাহলে যার চেহারা বড়োসড়ো, তার শরীর থেকে যাতে কম তাপ বেরিয়ে যায় সেইজন্য হার্ট আস্তে আস্তে চলবে। তাই তো ছোটমামা?

—উহুঁ, ঠিক হলো না।

—ভুলটা হলো কোথায়?

হেসে ফেললো ছোটমামা।

—আসলে যে প্রাণী যতো ছোট হবে তার ত্বক দিয়ে ততো বেশী তাপ বেরিয়ে যাবে। সেই হিসেবে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে ছোট ছোট প্রাণীদের হার্টবিটও কম হওয়া উচিত নয় কি?

বুঝলাম না। সোজা করে বুঝিয়ে দাও।—টুম্পার মুখ দেখে মনে হলো যথেষ্ট হতাশ হয়েছে।

ঠিক আছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তোদের বুঝতে সুবিধে হবে।—নড়েচড়ে বসলো ছোটমামা: ধর্, একটা বাক্সে কুড়িটা সাবান টাইট্‌ভাবে প্যাক করে রাখা আছে। প্রত্যেকটা সাবানের মাপ তিন সেণ্টিমিটার বাই দু' সেণ্টিমিটার বাই এক সেণ্টিমিটার। এবার চট্ করে বলতো প্রত্যেকটা সাবানের আয়তনই বা কতো আর ক্ষেত্রফলই বা কতো হবে? তারপরে বলবি বাক্সের আয়তন আর ক্ষেত্রফল কতো?

একটা একটা করে বরং বলি।—টুম্পা বললো: সাবানের আয়তন হচ্ছে

৩×২×১ মানে ছ' কিউবিক সেণ্টিমিটার আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ২(৩×২)+২(৩×১)+২(২×১), অর্থাৎ মোটমাট বাইশ স্কোয়ার সেণ্টিমিটার।

—আর বাক্সের বেলা ?

—কুড়িটা সাবান ধরে বললে না ? তাহলে আয়তন হচ্ছে ৩×২×২০ বা একশো বিশ কিউবিক সেণ্টিমিটার আর ক্ষেত্রফল হলো দুশো বারো স্কোয়ার সেণ্টিমিটার।

গম্ভীরভাবে কপালে টোকা দিলো ছোটমামা।

—এবার একক আয়তনে ক্ষেত্রফল বার কর্ তো ? সোজা হিসেব, ক্ষেত্রফলকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে ফেল্।

চট্ করে টেবিল থেকে কাগজ-পেন্সিল টেনে নিলো গাবলু।—সাবানের বেলায় ৩.৬৬ আর বাক্স হলে ১.৭৭।

তাহলেই দেখ্।—ছোটমামা হাসলোঃ আয়তন যতো বাড়ছে একক আয়তনে ক্ষেত্রফল কমছে তো ? বড় বড় জীবজন্তুদের একক আয়তনে 'বডি সারফেস্ এরিয়া' মানে ত্বকের ক্ষেত্রফল কম। আবার মজার ব্যাপার দেখ্, সাইজ যতো ছোট হচ্ছে একক আয়তন পিছু ক্ষেত্রফলও বেড়ে যাচ্ছে !

তাহলে যদি শুধু ত্বকের কথা ধরি, তবে একক ক্ষেত্র দিয়েও ছোট ছোট প্রাণীদের তাপ বেরুনোর হার বড় প্রাণীদের থেকে বেশী ?—ছোটমামার মুখের দিকে তাকালো টুম্পা।

পরিষ্কার মাথায় ঢুকে গেছে।—চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালো ছোটমামা।

তোমার ধাঁধাটা সমাধান করে ফেললাম বলো ?—গম্ভীরভাবে মাথা দোলালো টুম্পাঃ যেহেতু ছোট প্রাণীদের শরীর থেকে তাপ বেশী বেরিয়ে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখছে, সুতরাং তাদের হার্টও পাম্প করছে বেশী বার। তাই বেশী পরিমাণ অক্সিজেন ও রক্ত শরীরে যাচ্ছে যাতে খাবার দাবার পুড়িয়ে বেশী তাপ তৈরী হয়। আচ্ছা ছোটমামা, পাখীরা কি তাই এতবার করে খায় ?

ছোটমামা বললো—ঠিক বলেছিস্। হার্ট আর রক্ত চলাচল নিয়ে আরো অনেক মজার মজার ব্যাপার জানবার আছে, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে সে-সব গল্প শোনাবো।



বিচিত্র অ্যাকোয়ারিঅ্যাম !

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গা-গড়ানো দরকার। বালিশটা এগিয়ে দে তো।—গাবলুর দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা।

ছোটমামা, একজন লোক যদি গড়ে বাঁচে সত্তর বছর আর দুপুরে দুই প্লাস রাতে ছয়, মোটমাট দিনে আট ঘণ্টা হিসেবে এরকম 'কুম্ভকর্ণ'-মার্কা' ঘুমোয়, তাহলে সারা জীবনে স্রেফ তেইশটি বছরই সে ঘুমিয়ে কাটাবে। সুতরাং ঘুমের আবেদন নাকচ!—পাশ থেকে ফোড়ন কাটে টুম্পা।

বোঝাই যাচ্ছে "পারসেণ্টের অংক" তুই মুখে মুখে ভালই কষতে পারিস। কিন্তু না ঘুমোলেও খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার, এটা তো জানিস।—মুচকি হেসে বললো ছোটমামা ঃ তাছাড়া সকালের সর্তটাও আমার মনে আছে।

বালিশটা এগিয়ে দিতে দিতে গাবলু শুধোয়—আচ্ছা ছোটমামা, আমাদের যেমন হার্ট আছে, পৃথিবীর সব প্রাণীরই কি হার্ট আছে?

আসল ব্যাপারটা কি জানিস গাবলু, হার্ট থাক আর নাই থাক, সব প্রাণীর মধ্যেই কোন না কোন ভাবে হার্টের কাজটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কোন প্রাণীরই হার্টের ব্যাপারে প্রকৃতি 'হার্টলেস' নয়।—বিছানার পাশে টুলে রাখা জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা।

কিন্তু ধরো, কেঁচোর থেকে নীচে যে-সব প্রাণী—

টুম্পার কথা শেষ হবার আগেই ছোটমামা বললো—রক্ত চলাচলের ব্যাপার-স্যাপার কেঁচো ধরণের প্রাণীদের মধ্যে বেশ ভালভাবে বোঝা গেলেও, একটু চিন্তা করে দেখ, কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াকে বাদ দিলে, সবাইকার-ই তো অক্সিজেন দরকার? তা গাবলু, স্কুলের মাইক্রোসকোপে 'অ্যামিবা' দেখেছিস তো? এই একটা কোষ দিয়ে তৈরী অ্যামিবার পূর্বপুরুষেরা যখন পৃথিবীতে প্রথম তৈরী হলো, তখন চারপাশের জলের সাথে তার তফাৎ ছিলো সামান্যই;

ছোট্ট একটা সেলোফিনের পর্দার মতো জিনিস দিয়ে যেন একবিন্দু জলকে মুড়ে রাখা হয়েছে।

—তোরা প্রোটোপ্লাজমের নাম শুনেছিস্ নিশ্চয়ই? কোষের মধ্যেকার নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে পাতলা জেলীর ভাগ—সেটাও কিন্তু সবসময় খুব অল্প অল্প কাঁপছে। ব্যাপারটা একটু ভাল করে বোঝার চেষ্টা কর—যেই বাইরে থেকে কোন ছোট্ট খাবারের টুকরো কোষের মধ্যে ঢুকছে, ছোট্ট ছোট্ট তরঙ্গ বা প্রোটোপ্লাজমের কাঁপুনী সেগুলোকে সমস্ত কোষটার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটাই তো হার্টের কাজ?

কিন্তু ছোটমামা—টুম্পা বলে উঠলো: সময় তো আর থেমে থাকে নি! প্রাণিজগতে রূপান্তর চলতে চলতে অ্যামিবা থেকে মানুষ এসেছে তো? সুতরাং ঐ প্রোটোপ্লাজমের কম্পন থেকেই হার্ট এসেছে নিশ্চয়ই?

—সে তো বটেই। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবি, অ্যামিবাদের মতো প্রাণীদের পরেই এসেছে স্পঞ্জেরা!

—আচ্ছা ছোটমামা, তুমি যে স্পঞ্জের কথা বলছো আর স্নান করার স্পঞ্জ, দুটোই কি এক জিনিস?

ছোটমামা হাসলো—হ্যাঁ, দুটোই এক। তবে বাথরুমে যেটা আছে, সেই প্রাণীটা মরে গেছে, পড়ে আছে তার কাঠামোটা। অবশ্য আজকাল বাজারে বেশীর ভাগই নকল স্পঞ্জ। যাক গে, যে কথা বলছিলাম। স্পঞ্জের গা'টা ভাল করে দেখেছিস্ কি?

হ্যাঁ, সবটাই ফুটো ফুটো।—গাবলুর চট্‌জলদি জবাব।

—শুধু তাই নয়, ফুটোগুলো আবার ভেতর দিকে সব জোড়া। মানে যে কোন একটা ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলেই একেবারে গোলকধাঁধা। গোটা শরীরটা জুড়ে আছে। সাগরের জল ফুটো দিয়ে ঢুকে ভেতরটা ধুয়ে দিচ্ছে, তার সাথেই সারা শরীরে খাবার আর অক্সিজেন যোগানোর কাজটাও হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই না, ঐ সুড়ঙ্গগুলোর দেওয়ালে ইঁটের মতো যে কোষগুলো আছে, তারা আবার শুঁড়ওয়ালা।

গাবলু বললো—শুঁড়গুলো কেন?

—কারণটা একই। জলে ঢেউ তুলতে হবে তো? তা না হলে জলটা শরীরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে কি করে?

প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটারেটাদের তো এইভাবে চললো, অথচ যারা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে এলো, তাদের তো এই ব্যবস্থায় চলবে না?—টুম্পা সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়!

ছোটমামা বললো—সিস্টেম আলাদা হলে ও মূল কায়দাটা কিন্তু একই। বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে জল থেকে ডাঙ্গায় যখন যখন প্রাণীরা উঠলো তারা কিন্তু

নিজেদের শরীরের মধ্যেই খানিকটা সমুদ্রের জল আটকে রেখে দিলো। ক্রমে নানাভাবে সেটা পাল্টাতে পাল্টাতে তৈরী হলো রক্ত।

প্রশ্ন করে দিদি ফার্স্ট হবে, ব্যাপারটা বোধহয় গাবলুর পছন্দ হলো না। তাই চট্ করে প্রশ্ন করে বসলো—আচ্ছা ছোটমামা, শরীরে সব থেকে বেশী জল কারা আটকে রেখেছে?

একটু ভেবে নিলো ছোটমামা।

—ওজনের কত ভাগ জল, এই হিসেবটা ধরলে ফার্স্ট হবে শামুকেরা। ওদের শরীরের নব্বই ভাগই জল। কীটপতঙ্গদের শরীরে জলের ভাগটা তার চেয়ে কম—ওজনের পঁচিশ ভাগ। অবশ্য বাচ্চা বেলায় আরও বেশী থাকে। পাখী আর স্তন্যপায়ীদের শরীরের মধ্যেকার 'অ্যাকোয়ারিঅ্যামগুলো' আরো ছোট —ওজনের সাত থেকে দশ ভাগ। আর সব চাইতে পুঁচকে 'অ্যাকোয়ারিঅ্যাম' হচ্ছে মাছেদের—ওজনের দেড়ভাগ থেকে তিনভাগ।

তাহলে রক্তের সঞ্চয় যার শরীরে যত কম, তাকে নিশ্চয়ই ততো বেশী বার রক্তটা শরীরের মধ্যে ঘোরাতে হবে; কারণ ঐ একই জিনিস তো বারবার অক্সিজেন আর খাবার যোগান দেবে?—ছোটমামার মাথার বালিশটা ধরে আস্তে টান মারলো টুম্পা।

গাবলু বললো—আমাদের পুরো শরীরটা চক্কোর দিয়ে ঘুরে আসতে রক্তের তাহলে কতটা সময় লাগছে?

বালিশটা মাথার নীচে চালান করে দিলো ছোটমামা—মোটামুটিভাবে ধর্, তেইশ সেকেন্ড। মানে সারাদিনে আমাদের রক্তটা প্রায় পৌনে চার হাজার বার শরীরের ভেতর পাক খাচ্ছে। অবশ্য প্রাণীটা যতো ছোট হবে, তার রক্তও শরীরের ভেতর তত বেশীবার পাক খাবে। যেমন ধর্, কুকুর বা বেড়ালের বেলায় সময়টা লাগছে পনেরো বা ষোলো সেকেন্ড; খরগোসের বেলায় আরো কম— সাত-আট সেকেন্ড মাত্র।

টুম্পা বললো—তাহলে যার হার্ট যতো আস্তে কাজ করবে তার রক্তও ততো আস্তে ঘুরবে বলো?

অবশ্য এ ব্যাপারে পোকামাকড়রা একদম নবাবী চালে চলে।—ছোট্ট করে হাই তুললো ছোটমামা: আরশোলার শরীরে রক্ত চক্কোর খেতে সময় নেয় কমপক্ষে পাক্কা আধঘণ্টা।

নাক সিঁটকালো টুম্পা।—ছিঃ, নাম শুনলেই ঘেন্না করে। কিন্তু ছোটমামা, পোকামাকড়দের রক্তই বা কই, হার্টই বা কোথায়?

—আরে বাবা, হার্ট তো প্রথম এসেছে ওদের মধ্যেই। অবশ্য সেখানে হার্ট বলতে শরীরের মধ্যেকার একটা নল, যেটা সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছে। ঐ বড়

নলটা থেকে ছোট ছোট অনেকগুলো নল বেরিয়েছে। এখন ধর্, হার্ট পাম্প করে শরীরের ভেতরের জলটা বা রক্ত যাই বল, তাকে পাঠালো ক্ষুদে নলগুলোর মধ্যে। এখন ঐ ছোট নলগুলোর একমুখ খোলা। অর্থাৎ জলটা গিয়ে পড়বে সোজা শরীরের ভেতরকার গর্তে।

গাবলু বললো—শরীরের ভেতরের গর্তটা আবার কি?

—শরীরের দেওয়ালের ভেতরের গা আর ভেতরের কলকব্জার মাঝখানের জায়গাটা, সেটাই হলো শরীরের ভেতরের গর্ত বা 'সিলোম'। এখন মজার ব্যাপার দেখ্, হার্ট পাম্প করার ফলে রক্তটা তো খোলা জায়গায় গিয়ে পড়লো। সেটাকে আবার হার্টের মধ্যে ঢোকাতে হবে তো? পোকামাকড়দের হার্টে, মানে ঐ পাইপটার সঙ্গে কতকগুলো মাসল্ আটকানো আছে। মাসল্গুলো টানলেই পাইপের গা'টা বাইরের দিকে সরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পাইপের ভেতরের চাপও যায় কমে। ফলে বাইরের থেকে রক্তও পাইপের মধ্যে চলে আসে। এটাকে বলতে পারিস খোলামেলা রক্ত চলাচল ব্যবস্থা। অর্থাৎ রক্ত হার্ট থেকে 'সিলোম' আবার 'সিলোম' থেকে হার্ট—এইভাবে যাবে।

প্রাণীদের মধ্যে যতো ওপরের দিকে যাবি, অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় যারা পরে এসেছে, তাদের মধ্যে রক্ত চলাচল ব্যবস্থা একেবার আঁটোসাঁটো। হার্ট থেকে বেরিয়ে নানা রক্তনালী বেয়ে রক্ত আবার হার্টেই ফিরে আসবে। তবে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত চলাচল ব্যবস্থাটা বেশ আঁটোসাঁটো হলেও এটাকে একটা চৌবাচ্চা বললেই যেন ভাল হয়। কারণ ভেবে দেখ্—রক্তের মধ্যে প্রায় বিরানব্বুই ভাগই হচ্ছে জল। এই জল আবার দরকার মতো রক্তে মিশছে, রক্ত থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে, অথচ ঐ বিরানব্বুই ভাগটা 'কন্স্ট্যান্ট' থেকে যাচ্ছে।

বাপস্, প্রায় একটা ক্লাস লেকচার দিয়ে দিলে!—টুম্পা একটু জল খেয়ে নিলো: ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে দাও। রক্তে জল মিশছে, মানে খাবার-দাবারের সঙ্গে যে জল আমাদের শরীরে যাচ্ছে, সেটাই শোষিত হয়ে রক্তে মিশছে। তাই তো? আবার ঘাম-টাম ব্যাপারগুলোতে যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা খরচের হিসেব তো?

—পারফেক্টলি অল রাইট!

—তবুও একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে ছোটমামা। ধরো, আমি পর পর পাঁচ গেলাস জল খেলাম—

—অসম্ভব! দিদি একবারে এক গেলাস দুধই খেতে পারে না!

—সেটা কোনো কথা নয়। ধরা যাক্, আমি একসাথে পাঁচ গেলাস জল খেয়ে ফেললাম। এই জল রক্তে মিশলে রক্তচাপ বাড়বে তো? রক্তচাপ বাড়লে

ধমনীর বা শিরার গায়ে বেশী ধাক্কা পড়বে ? রক্তজাল, অর্থাৎ যেখানে ধমনীর শেষ আর শিরার শুরু, সেই রক্তজালগুলোর গা'টা পাতলা—

মাঝখানে বাধা দিলো গাবলু—রক্তজালের ব্যাপারটা বুঝলাম না।

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—ছোটমামা গাবলুর দিকে কাত হয়ে শুলো : আগেই বললাম না মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত চলাচল ব্যবস্থাটা বেশ আঁটোসাঁটো ? হৃদ্‌পিণ্ড থেকে বেরুলো মহাধমনী, মহাধমনী থেকে ধমনী। ঠিক যেন বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা, ছোট রাস্তা থেকে গলি, গলি থেকে আরো ছোট গলি ; রক্তনালী হার্ট থেকে যতো দূরে যাচ্ছে, তারাও ততো সরু হয়ে যাচ্ছে।

যেহেতু আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা, রক্তকে শেষমেষ তো হার্টে ফিরতেই হবে ? ধমনীর শাখা-প্রশাখা—উপশাখা যখন চুলের মতো সরু হয়ে গেল, যার নাম রক্তজালক, সেখান থেকে শিরার শুরু। ছোট্ট ছোট্ট চুলের মতো শিরা জুড়ে তৈরী হলো উপশিরা, উপশিরা থেকে ছোট শিরা, ছোটশিরা থেকে বড়শিরা, মহাশিরা বেয়ে রক্ত শেষমেষ গিয়ে ফিরলো হার্টে। টুম্পা বল্‌ তুই কি বলছিলি ?

টুম্পা বললো—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বেশী জল খেয়ে যদি রক্তচাপ বাড়ে, সেই বাড়তি চাপের ফলে জলটা তো রক্তজালের পাতলা গা দিয়ে 'লিক্‌' করে বেরিয়ে যাবে। সেখানে জমা খরচের হিসেবটা মিলবে কি ?

ছোটমামা চিৎ হয়ে শুলো।

—অবশ্যই মিলতো না, মাঝখানের একটা 'যদি' না থাকলে !

—'যদি'-টা কি ?

—যদি-টা হচ্ছে প্লাজমা-প্রোটিন ! রক্তের মধ্যে জলের জমা খরচের 'দাঁড়িপাল্লাটা' ধরে আছে ওরাই।

গাবলু বললো—প্লাজমা-প্রোটিন আবার কি ?

—রক্তের মধ্যে দুটো ভাগ আছে জানিস তো ? কণিকা আর রক্তরস ? ঐ রক্তরসে যে-সব প্রোটিন থাকে তাদের নাম হলো প্লাজমা-প্রোটিন। এদেরও নানা রকমফের আছে। 'অ্যালবুমিন', 'গ্লোবিউলিন', 'ফাইব্রিনোজেন'—নানা খট্‌মট্‌ নাম।

গাবলু মুখটা গম্ভীর করলো।

—জানি, রক্ত জমাট বাঁধতে 'ফাইব্রিনোজেন' কাজে লাগে। কিন্তু জলের জমা খরচের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক ?

টুম্পাও মাথা নাড়লো।

—একটু বুঝিয়ে বলো তো ?

আড়মোড়া ভেঙ্গে আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসলো ছোটমামা।

—ধর্, শহরের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা গেছে। রাস্তার দুপাশে বাড়ী। রাস্তাটা যদি শিরা বা ধমনী হয়, বাড়ীগুলো হচ্ছে 'সেল' বা কোষ। কোষগুলোর চারপাশেও জলীয় মাধ্যম আছে।

'টিস্যু ফ্লুয়িড,'—পাশ থেকে বলে ওঠে টুম্পা।

—ঠিক বলেছিস। রক্তের সাথে কোষের আদানপ্রদানের সব ব্যাপারটা ঘটে এই টিস্যু-ফ্লুয়িডের মারফৎ। এখন প্রশ্ন হলো, জল কোনদিকে যাবে? রক্ত থেকে টিস্যু-ফ্লুয়িডে না উল্টোদিকে?

এখানেই কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে মনে হয়?—গাবলু একটু নড়ে চড়ে বসলো।

—ব্যাপারটা তুই ধরেছিস ঠিকই। দুটো জিনিস এখানে কাজ করছে। রক্তের চাপ জলকে ঠেলে বাইরে পাঠাতে চাইবে। প্লাজমা-প্রোটিনের অণুগুলো চেষ্টা করবে জলকে টেনে রাখার। এবার 'ক্যাপিলারী' বা রক্তজালের কথা ভাব। —অর্থাৎ চুলের মতো সরু রক্তনালী যার একদিকে ধমনীর শেষ, অন্যদিকে শিরার শুরু?

—ঠিকই। যখন রক্তজালে রক্ত এসে ঢুকছে, এখানেই রেষারেষি শুরু হয় রক্তের চাপ বা 'হাইড্রোষ্ট্যাটিক প্রেসার' আর প্লাজমা প্রোটিনের টান বা 'অংকোটিক প্রেসারের' মধ্যে। এখানে জিতে যায় রক্তের চাপ, কারণ তার জোরটা বেশী। চাপে পড়ে জল বেরিয়ে যায় রক্তজালের বা 'ক্যাপিলারীর' দেওয়াল দিয়ে। কিন্তু ক্যাপিলারীর ওদিকের প্রান্তে, মানে যেখান থেকে শিরা আরম্ভ হচ্ছে সেখানে ব্যাপারটা একদম উল্টো। 'অংকোটিক প্রেসার' মানে প্লাজমা-প্রোটিনের টান বেশী থাকায় 'টিস্যু ফ্লুয়িড' থেকে জল এসে মেশে রক্তে।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা ছোটমামা, সব সময় কি রক্তের 'অংকোটিক চাপ' সমান থাকে?

গম্ভীরভাবে ভ্রূ কোঁচকালো ছোটমামা।

—বিশেষ কতকগুলো অসুখ-বিসুখে প্লাজমা-প্রোটিন কমতে বা বাড়তে পারে। যেমন ধর্, যদি শরীরে 'ডিহাইড্রেশন' হয় অর্থাৎ কলেরা হয়ে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায় বা মারাত্মকভাবে কেউ পুড়ে যায়, কিংবা ধর্, 'মালটিপল্ মায়লোমা' বলে বিশেষ একটা অসুখে, যেখানে হাড়ের ভেতরকার 'মজ্জা' বা 'বোনম্যারো'তে টিউমার হয়, সে-সব ক্ষেত্রে রক্তে প্লাজমা-প্রোটিনের ভাগ বেড়ে যাবে।

—আবার অন্যদিকে যদি কেটে গিয়ে অনেকটা রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যায় অথবা লিভারের অসুখ হয়, তাহলে রক্তে প্লাজমা-প্রোটিন কমবে। এটা তো জানিস্, প্লাজমা-প্রোটিন তৈরী হয় যকৃতে বা লিভারে?

চট্ করে উঠে পড়লো টুম্পা।

—আসলে লিভারের সঙ্গে হজমের গভীর সম্পর্ক আছে। একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। জাম খাবে? মা নুন দিয়ে জারিয়ে রেখেছে, খেতে 'ফাইন' হবে!

তোরা খা।—ছোটমামা হাসলো ঃ জামের কথা বললেই বাঁদর আর কুমীরের গল্পটা মনে পড়ে যায়। অবশ্য জাম খেতো বলেই বোধ হয় বাঁদরটার বুদ্ধি বেড়েছিলো, না হলে গাছের ওপর হার্ট রেখে আসার গল্প মাথায় আসে? সেই ঈশপের গল্প! মনে নেই?

যতো সব উদ্ভট কল্পনা।—মুখ বাঁকালো টুম্পা ঃ গাছে হার্ট রেখে আসতে হলে নিদেনপক্ষে হার্ট হওয়া দরকার দুটো। এমন তো কোনো জন্তুর কথা শুনিনি যাদের একটার বেশী হার্ট আছে! ফুসফুস, কিডনী, এসব জোড়া জোড়া হলেও দুটো হার্ট—না, ভাবাই যায় না।

—ভাবা না গেলেও ব্যাপারটা কিন্তু বিলকুল সত্যি। দুটো কেন, অনেকগুলোই হার্ট থাকতে পারে স্রেফ একটা প্রাণীর মধ্যে!

জন্তুটা পৃথিবীতে পাওয়া যায়?—ছোটমামাকে জব্দ করার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলো না গাবলু।

—অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে এই পৃথিবীর ঠিক ওপরে নয়, মাটির কয়েক ইঞ্চি নীচে। একটু আগে কেঁচোর কথা উঠেছিলো না? ওদেরই তো অনেকগুলো হার্ট আছে।

টুম্পা বললো—বুঝিয়ে বলো।

আধশোয়া হয়ে এতক্ষণ বসেছিল ছোটমামা, ফের শুয়ে পড়লো।

—আসলে কেঁচোদের হার্ট অনেকটা কীট-পতঙ্গদের মতোই। একটা সরু টিউব পিঠ বরাবর সটান চলে গেছে। ওর কাজ রক্তকে পাম্প করে পেছন থেকে সামনে ঠেলে পাঠানো। এখন এই লম্বা টিউব থেকে পাশের দিকে ছোট চারজোড়া টিউব বেরিয়েছে। এই ছোট টিউবগুলো কিন্তু পাম্প করতে পারে। পাম্প করে ওরা রক্তটা পাঠাচ্ছে আরো ছোট ছোট অসংখ্য টিউবে, ধমনী বলতে পারিস্ আর কি! তাহলে মূল টিউবটা আর ছোট চারজোড়া টিউব ধরলে, হার্টের সংখ্যা কত হলো শুনি?

ওরে বাব্বা! চোখ গোল গোল করে ফেললো গাবলু ঃ এ যেন বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা, ছোট রাস্তা থেকে গলি, ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা!

—ঠিক বলেছিস্। বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে প্রাণীরা যত ওপরে উঠেছে, হার্টও তো ততো বেশী জটিল হয়েছে? পোকামাকড়দের একটাই স্পন্দনশীল হার্ট, কতটুকু রক্তই বা সে ঠেলতে পারবে? পাম্প করার টিউব বেশী হলে রক্ত চলাচলও তো আরো ভালভাবে হবে?

বিবর্তনের পরের ধাপে হার্টের চেহারাটা কেমন হলো ?—গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে টুম্পা।

এটা ভারী জটিল প্রশ্ন হলো।—ছোটমামা চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাখলো পাশের টেবিলে ঃ বিবর্তনের প্রতি ধাপেই হার্টের কম-বেশী পরিবর্তন কিছু না কিছু হয়েছেই। তোদের বরং 'অ্যাসিডিয়ার' হার্টের কথাটা বলি।

গাবলু-টুম্পা একসাথেই প্রায় বলে উঠলো—'অ্যাসিডিয়া' কি ?

—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একদম নীচের ধাপে 'অ্যাসিডিয়া' বলে এক ধরণের প্রাণী আছে। এরা সাগর জলের বাসিন্দা, মেরুদণ্ডগোছের একটা জিনিস আছে বটে, তবে তা বিশেষ শক্তপোক্ত নয়। বলা যেতে পারে মেরুদণ্ডের আগের অবস্থা—'নোটোকর্ড'। অ্যাসিডিয়াদের হার্টটা ভারী মজার! হার্ট মানে রক্তবহা নালীর 'ল্যাজা' আর 'মুড়ো', দুটো দিকই পাম্প করতে পারে। একটা দিক কাজ করলে অন্য দিকটা বিশ্রাম নেয়।

টুম্পা বললো—হুঁ। সুকুমার রায়ের 'হুঁকোমুখো হ্যাংলার' দুটো ল্যাজের মতো।

—প্রায় তাই। মজাটা হচ্ছে যেহেতু এরা দুপাশে আছে, একটা থেমে অন্যটা চললে রক্ত-প্রবাহের গতিটাও উল্টে যায়। অনেকটা সেই দম দেওয়া খেলনা গাড়ীর মতো। খানিকটা সোজা গিয়ে আবার গড়গড় করে পেছনে চলতে শুরু করবে।

টুম্পা-গাবলু দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভ্রু কোঁচকালো গাবলু।

—তখন থেকে তুমি বার বার রক্ত বলছো কেন? পোকামাকড়দের আবার রক্ত কোথায় ?

ছোটমামা বললো—ওদের রক্তের নাম হচ্ছে 'হিমোলিম্ফ্'। তবে এর কোন রঙ নেই, জলের মতো দেখতে। চিংড়ীর 'হিমোলিম্ফ্'-টা নীলচে ; কারণ আমাদের রক্তে যেমন লাল 'হিমোগ্লোবিন' আছে, ওদের রক্তের রংচঙে নীল অংশটার নাম 'হিমোসায়ানিন্।'

রক্তে যদি 'হিমোগ্লোবিন'-ই না থাকলো, তবে অক্সিজেন বইবে কে ?—টুম্পা মনে হলো একটু যেন ধাঁধায় পড়ে গেছে!

—তোকে কে বলেছে যে পোকামাকড়দের শরীরের রক্ত অক্সিজেন বয়ে বেড়ায় ?

তবে ?—একটু যেন খটকায় পড়ে টুম্পা।

একেবারে ফাঁপা সিস্টেম, এমন কি মাথা পর্যন্ত।—বিরাট একটা হাই তুললো ছোটমামা।

—মানে ?

—শরীরের পাশ বরাবর হাওয়া ঢোকার ফুটো আছে। যে টিউবগুলো দিয়ে

বাতাস ওদের শরীরে ঢুকছে সেগুলো শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে।

টুম্পা বললো—এমনিতেই তো ছোট্ট শরীর, শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখাগুলো তাহলে কত ছোট হবে ?

—তা ধর্, মাপটা হলো এক 'মাইক্রন', অর্থাৎ এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ। মাপ বলতে আমি বোঝাচ্ছি টিউবগুলোর ব্যাস। এমন কি ঐ শাখা-প্রশাখার ভাগ 'ব্রেনের' মধ্যে সরাসরি ঢুকে গিয়ে অক্সিজেনের জোগান দিচ্ছে। সেই অর্থে ধরলে পোকামাকড়দের একদম 'ফাঁপা-মাথাওয়ালা' প্রাণী বলতে পারিস। এদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সরাসরি অক্সিজেনের জোগান পেয়ে যাচ্ছে, রক্তের সঙ্গে অক্সিজেনের সরাসরি সম্পর্ক নেই।

বাটি থেকে শেষ জামটা তুলে নিলো গাবলু।

—পোকামাকড়, কেঁচো, এমন কি অ্যাসিডিয়ার হার্টের গল্প শোনালে। কিন্তু আসলটাই বাকি রয়ে গেল যে ? মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী, বাঁদর, মানুষ....

আবার একটা বোম্বাই সাইজের হাই তুলে ছোটমামা বললো—বড্ডো ঘুম পাচ্ছে, একটুও ঘুমোতে দিবি না ?

—আশ্চর্য, একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আগে খেয়েছো, এখনো বলছো ঘুম পাচ্ছে ?

—নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা গেল না। এখনই তো হজম হয়ে খাবারগুলো রক্তে মিশতে শুরু করেছে। রক্তও তাই এখন অন্ত্রের দেওয়াল দিয়ে বেশী ছুটোছুটি করছে।

বেশী ছুটোছুটি মানে ?—জানলা দিয়ে জামের বীজটা বাইরে ছুঁড়ে দিলো গাবলু।

—একটু ভেবে দ্যাখ্, আমাদের সারা শরীরে রক্ত কতটা আছে ? খুব বেশী হলে পাঁচ, সাড়ে পাঁচ লিটার ? অথচ আমাদের শরীরে যে রক্তবাহীনালী জালের মতো ছড়িয়ে আছে, তারা কতটা লম্বা ? পরপর সবগুলো সাজালে অন্ততঃ একলাখ কিলোমিটার তো বটেই !

বলো কি ?—গাবলু আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না।

—একদম সত্যি কথা। তাহলে এবার বল্, পাঁচ লিটার রক্ত কতটা জায়গা আর সামাল দেবে ? যখন যার কাজ বেশী, রক্ত সেখানেই বেশী ছুটোছুটি করবে। যেমন ধর্, দৌড়ানোর সময় পেশী আর ফুসফুসের কাজ বেশী, সুতরাং রক্তের দৌড়ও সেখানে বেশী। আবার বেশী চিন্তা করলে 'ব্রেনের' পরিশ্রম বেশী, তখন রক্তও সেই দিকে যাবে। এখন আমার পেটের মধ্যে খাবারগুলো হজম হয়ে রক্তে মিশছে, সুতরাং রক্তের ছুটোছুটি অন্ত্রের দিকেই বেশী। একদিকে রক্ত বেশী গেলে, অন্যদিকে রক্ত যাবে কম। অর্থাৎ আমার 'ব্রেনে' রক্ত যাচ্ছে কম, তাই ঘুমও চেপে ধরেছে।—কাত হয়ে শুলো ছোটমামা।



কুঠিবাড়ির গল্প

কথাটা উঠলো সন্ধ্যেবেলা—চায়ের টেবিলে। সত্যবাবু মানে গাবলু-টুম্পার বাবা ফিরেছেন অফিস থেকে, ছোটমামাও ঘুম দিয়ে উঠেছে সবেমাত্র।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে টুম্পা বললো—ছোটমামা, তোমার টেকনিক্‌টা ভালই।

চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সত্যবাবু।

—কি ব্যাপার ?

টুম্পা মুচকি হেসে বললো—দুপুরে ছোটমামার গল্প বলার একটা চুক্তি ছিল। গল্পটা শুরু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো ছোটমামা স্রেফ ঘুমিয়ে পড়লো !

বিপন্ন মুখে পাঁউরুটিতে কামড় বসালো ছোটমামা।

—কি নিয়ে গল্পটা হচ্ছিলো বল্‌ তো ?

—এক্ষুনি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। কথাটা হচ্ছিলো হার্ট কিভাবে চেহারায় পালটেছে। অ্যামিবা থেকে শুরু করে তুমি মেরুদণ্ডীদের আগে পর্যন্ত এসেছিলে। কিন্তু মেরুদণ্ডীদের হার্ট নিয়ে কিছু বলার আগেই স্রেফ ঘুমোতে শুরু করলে তুমি !

আগেই বোধ হয় বলেছি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত-চলাচলের ব্যবস্থাটা বেশ আঁটোসাঁটো।—পাঁউরুটি শেষ করে চায়ের কাপটা টেনে নিলো ছোটমামা।

সত্যবাবু বললেন—একটু খুলে বলো। কোন ছোটবেলায় পড়েছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি।

গাবলু বললো—আসলে আমাদের রক্ত সব সময়ই নানা নলের মধ্যে দিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তাই তো ?

ছোটমামা বললো—গাবলু, তুই ঠিক বলেছিস। কিন্তু মজাটা হলো যে, সব মেরুদণ্ডীদের রক্ত-চলাচলের ব্যবস্থাটা মোটামুটি এক হলেও হার্টের ভেতরের চেহারাটা এক এক জায়গায় এক এক রকম।

টুম্পা এতক্ষণ ছোটমামার কথা শুনছিলো। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললো—সে তো জানি। মাছেদের হার্টের দুটো কুঠুরী, ব্যাঙদের তিনটে, সাপ বা টিকটিকি এদের হার্টের প্রায় চারটে চেম্বার, পাখী আর স্তন্যপায়ীদের পুরো-পুরি চারটে। কিন্তু আমার কথা হলো ধাপে ধাপে এই যে পরিবর্তন, এর কারণটা কি ?

পট থেকে কাপে আবার চা ঢালতে ঢালতে মুচকি হাসলো ছোটমামা।

—কারণ আছে বৈকি। মাছেদের কথাই ধর্ না। ওদের হার্টে দুটো চেম্বার। অবশ্য দুটো না হয়ে একটা হলেও বিশেষ ক্ষতি ছিলো না। আমাদের হার্টে যেমন পাশাপাশি বিশুদ্ধ রক্ত আর দূষিত রক্ত যাওয়া-আসা করছে ওদের তো সেরকম নয়।

একটু বুঝিয়ে বলো তো ?—শুধোয় গাবলু।

—আসলে মাছেদের হার্ট দিয়ে শুধুমাত্র দূষিত রক্ত চলাচল করে। হার্ট পাম্প করে সেই রক্ত পাঠাচ্ছে 'ফুলকায়'। এখন এটা তো জানিস—মাছেরা মুখ দিয়ে জল নিয়ে 'ফুলকা' দিয়ে ছেড়ে দেয়। হার্ট থেকে রক্তনালী 'ফুলকায়' গিয়ে অসংখ্য চুলের মতো ছোট ছোট 'রক্তজাল' মানে 'ক্যাপিলারী' তৈরী করছে। ঐ 'রক্তজাল' জল থেকে অক্সিজেন টেনে নিয়ে তার বদলে ছাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

—এখন, 'ফুলকা' থেকে যে রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেটা বিশুদ্ধ রক্ত। সেই রক্ত সারা শরীর ঘুরে হার্টে পৌঁছোনোর সময় অক্সিজেন ছেড়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বয়ে আনছে। তাহলে দ্যাখ্, হার্ট যদি সব সময়ই দূষিত রক্ত পাম্প করে তবে অতো কুঠুরী'র ভাগাভাগির দরকার কি ?

টুম্পা বললো—কিন্তু মাছের পরের ধাপ, অর্থাৎ ব্যাঙেরা ?

—আসল গণ্ডগোলটা তো শুরু হলো সেখানেই। মাছেদের হার্ট আর প্রধান ধমনী, এই দু'জনের মাঝখানে রয়েছে অসংখ্য 'রক্তজালওয়ালা' ফুলকা।

সত্যবাবু বললেন—এটা অনেকটা ইলেক্ট্রিক্যাল সারকিটে রেজিস্ট্যান্সের মতো কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে ?

গাবলু বললো—বাবা, ছোটমামার গল্প শুনছিলে নাকি ?

তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ছোটমামা।

—আপনি আপনার নিজের লাইনে বেশ ভাল একটা উপমা দিলেন। এখন, ধরা যাক্, মাছের শরীরের সারকিট থেকে ফুলকা নামক রেজিস্ট্যান্সটি সরিয়ে বসান হয়েছে ফুসফুসকে। এতে একদিকে সুবিধে পাওয়া গেলেও অন্যদিকে সমস্যারও সৃষ্টি হলো।

গাবলু বললো—সুবিধেটা কি ?

—আসলে ফুলকা থাকার দরুণ হার্ট থেকে ফুলকা, এই রাস্তায় রক্তের চাপ বেশী, আবার ফুলকা থেকে যে রক্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার চাপ অনেক কম। কিন্তু যেই ফুলকা সরে গেল, তখন ফুলকার 'রেজিস্ট্যান্সে'র অভাবে রক্তনালী দিয়ে রক্ত জোরে ছুটতে আরম্ভ করলো। মজাটা হচ্ছে রক্ত যত তাড়াতাড়ি যাবে, সারা শরীরে ততো বেশী খাবার আর অক্সিজেন পেঁছোবে। ফলে সেক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষমতাও বাড়বে।

সত্যবাবু চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখলেন।

—সুবিধেটা তো বোঝা গেল। কিন্তু সমস্যাটা হলো কোনখানে?

—একটু হাসল ছোটমামা ঃ সারকিটে প্রেসারের সমস্যা মিটলেও আর একটা সমস্যা কিন্তু রয়ে গেল। ফুসফুস থেকে কি ভাবে বিশুদ্ধ রক্ত সারা শরীরে যাবে আবার সারা শরীর থেকে দূষিত রক্তই বা ফুসফুসে ফিরবে কি করে? এখন, আমাদের প্রকৃতি দেবী কতবড় ইঞ্জিনিয়ার দেখুন, এমন একটা উপায় ঠিক হলো যাতে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না। অর্থাৎ ফুলকার কাজটা ফুসফুস করবে, কিন্তু তাকে রাখতে হবে এমনভাবে যাতে এই 'হাই প্রেসার সারকিট'টা নষ্ট হয়ে আবার সেই পুরোনো 'লো-প্রেসার সারকিট' না হয়ে যায়।

গাবলু বললো—এটা হলো কি করে?

—সোজা ব্যাপার। মাছেদের রক্ত যেমন একটা 'সারকিটে' চলাচল করছিল, ফুলকার বদলে ফুসফুস এমনভাবে বসলো যে দুটো 'সারকিট' তৈরী হলো। একটার নাম 'সিস্টেমিক সারকিট' অর্থাৎ এই রাস্তা ধরে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে সারা শরীরে অক্সিজেন আর খাবার-দাবার যোগান দিয়ে পরিবর্তে কার্বন.ডাই-অক্সাইড নিয়ে হার্টেই ফিরে আসবে। আর 'দু-নম্বর সারকিট' হলো 'পালমোনারী সারকিট' অর্থাৎ হার্ট থেকে দূষিত রক্ত এই রাস্তায় ফুসফুসে গিয়ে বিশুদ্ধ হয়ে আবার হার্টেই ফিরে আসবে।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে এই দুটো সারকিটকে জুড়েছে আমাদের হার্ট?

—সে তো নিশ্চয়ই। এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা হচ্ছে তা হলো হার্টের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ আর দূষিত—এই দু-রকমের রক্তই যাতায়াত করছে।

টুম্পা বললো—তাহলে দু-রকমের রক্ত মিলেমিশে এক যাতে না হয়ে যায় তার জন্যই এই কুঠুরীর ভাগাভাগি?

সে তো বটেই, তবে মাছেরা যে জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠবে তার একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল 'ডিপনয়' বা 'লাংফিস'দের মধ্যেই। মাছেদের হার্টের কাঠামোটা খুব সাদামাটা—একটা অলিন্দ, একটা নিলয়, নিলয় থেকে ফুলকায় যাবার

রাস্তাটা গোড়াতেই একটু পেটমোটা ; ঐ জায়গাটার একটা খটোমটো নামও আছে—'বালবাস্ আর্টেরিওসাস্'। এখন 'ডিপনয়' বা লাংফিসে'র হার্টে দেখা যাচ্ছে ওদের অলিন্দের ভেতর একটা পার্টিশন দেওয়াল আছে। নিলয়ের মধ্যেও একটা পার্টিশন আছে, তবে সেটা সম্পূর্ণ নয়। এমনকি ঐ 'বালবাস্ আর্টেরিওসাস'-এর ভেতরের মাংসপেশীগুলো এমন খাঁজের মতো উঠে আছে যে সেখানেও একটা আংশিক পার্টিশন তৈরী হয়েছে। তাহলেই দেখ্, একই হার্টের মধ্যে দিয়ে দু-রকম রক্ত যাবে, অথচ তারা গা ছোঁয়াছুঁয়ি করবে না, 'ডিপনয়'র মধ্যে তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে না ?—একটানা কথা বলে দম নেওয়ার জন্য থামলো ছোটমামা।

টুম্পা বললো—ডিপনয়ের এই কাঠামোটাই মনে হচ্ছে ব্যাঙের মধ্যেও আছে। ওদের বেলায় দেখেছি দুটো অলিন্দ, একটা নিলয়, তার মধ্যেও হাফ পার্টিশন আছে ; আবার নিলয় থেকে ধমনী বার হবার মুখেও একটা দেওয়াল-মোটা অংশ আছে। কি যেন নামটা বেশ........ ?

—'কোনাস আর্টেরিওসাস'। ওটাকে বলতে পারিস বিবর্তনের ফলে 'বালবাস আর্টেরিওসাসে'র পরিবর্তিত চেহারা। চেহারাটা পাল্টাচ্ছে, নামটাও গেছে পাল্টে। পেটমোটা বেলুনের মতো চেহারা—তার নাম 'বালবাস্'। বেলুনটা থেবড়ে খানিকটা তিনকোনা 'শঙ্কু'র আকার নিয়েছে, তাই তার নাম হয়েছে 'কোনাস'।

গাবলু জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু ওদের নিলয়ের মধ্যে গোটা পার্টিশন না থাকলে দু-রকম রক্ত মিশে যাবে না ?

—সে তো মেশেই। শুধু ব্যাঙ কেন, সরীসৃপদেরও তো ব্যাপারটা একই রকম ! তবে বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে যারা যতো উপরে উঠেছে তাদের মধ্যে এই বিশুদ্ধ-রক্ত দূষিত-রক্ত মেশামেশির ব্যাপারটা ততো কম।

টুম্পা বললো—ছোটমামা, এইখানে আমার মনে একটু ধাঁধা আছে। শুনেছি কুমীরদের হার্ট পুরো চার কুঠুরীওয়ালা। তাহলে সেক্ষেত্রে রক্ত মেশামেশি হবার চান্সটা কোথায় ?

ছোটমামা বললো—কথাটা তুই প্রায় ঠিক বলেছিস। সরীসৃপদের মধ্যে কুমীররা জাতে উঁচু, কারণ পাখী আর স্তন্যপায়ীদের মতো ওদেরও হার্টে চারটে কামরা। বিশুদ্ধ রক্ত আর দূষিত রক্ত হার্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু একে অপরের সাথে মিশছে না মোটেই। তা গাবলু, হার্টের কোন কামরায় কি ধরণের রক্ত-চলাচল করে জানিস তো ?

—এটা তো সবাই জানে। ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত আসছে অলিন্দের বাঁ-দিকের ঘরে, সেই রক্ত বাঁ-দিকের নিলয় দিয়ে মহাধমনী হয়ে সারা শরীরে

ছড়াচ্ছে। আবার সারা শরীরের দূষিত রক্ত মহাশিরাগুলো দিয়ে অলিন্দের ডানদিকের ঘরে ঢুকছে। সেখান থেকে রক্ত অক্সিজেন নেবার জন্য ফুসফুসীয় ধমনী দিয়ে যাচ্ছে ফুসফুসে। তারপর—

—ব্যাস্, ব্যাস্, আর বলতে হবে না। জিজ্ঞাসা করতেই বই মুখস্থ বলছে। যে কথা বলছিলাম। সরীসৃপদের বেলায় পার্টিশনের ভেতরের গা ঘেঁষে বাঁ-নিলয় থেকে রক্তবাহী ধমনী বেরিয়ে দু-ভাগে ভাগ হয়ে দুপাশে চলে গেছে। এদের নাম 'সিস্টেমিক আর্চ'। মজা হচ্ছে বাঁ দিকে সিস্টেমিক আর্চের গোড়ায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, যার নাম হোল 'ফোরামেন প্যানজি'। এর সঙ্গে নিলয়ের ডান-দিককার কুঠুরীর একটা সংযোগ আছে। ফলে হার্ট যখন পাম্প করে রক্ত ফুসফুসে পাঠাচ্ছে, তখনই ডানদিকের নিলয় থেকে খানিকটা দূষিত রক্ত 'লিক্' করে 'ফোরামেন প্যানজি'র রাস্তা ধরে বাঁ-দিকের 'সিস্টেমিক আর্চে'র বিশুদ্ধ রক্তের সঙ্গে মিশছে। ক্রমশঃ বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে যখন পাখী আর স্তন্যপায়ীরা এলো, 'ফোরামেন প্যানজি' গেল বন্ধ হয়ে, 'সিস্টেমিক সার্কিট' আর 'পালমোনারী সার্কিট' সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। প্রতিবার হার্টের ধুকপুকুনির সাথে দিব্যি দুটো 'সারকিটে'ই রক্ত-চলাচল করতে লাগলো, অথচ মেশামিশির ভয়টাও আর রইলো না।

টুম্পা কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা ছোটমামা, হার্টের ঐ ধুক্-পুক্ আওয়াজটা তৈরী হচ্ছে কি করে?

ছোটমামা হাসলো।

—হার্ট যদি মিনিটে বাহাত্তর বার ধুক্-পুক্ করে, তাহলে একবারে সময় লাগছে কতটা?

টুম্পা হিসেব করে বললো—এক সেকেন্ডেরও কম।

—হ্যাঁ, ঠিক হিসেবটা হলো দশমিক আট সেকেন্ড। এর মধ্যে ওপর আর নীচের অংশ সময় ভাগাভাগি করে নিচ্ছে।

গন্ডগোলে ফেলে দিচ্ছো মনে হচ্ছে?—পাশের সোফাটায় ধুপ্ করে বসে পড়ে টুম্পা।

—গন্ডগোলের কিছু নেই। গাবলু, হার্টের ঘর কটা?

ওপরে দুটো অলিন্দ, নীচে দুটো নিলয়, মোটমাট চারটে।—গাবলুর চট্পট্ জবাব।

—কারেক্ট। দশমিক আট সেকেন্ডের মধ্যে ওপর আর নীচ, দুটো অংশেরই সংকোচন-প্রসারণ সেরে ফেলতে হবে। দুজনের হিসেব কিন্তু দু-রকম। ওপর তলায় এক আর সাত। নীচের তলায় হিসেব তিন আর পাঁচ।

গাবলু বললো—অর্থাৎ?

—ওপর তলায় কুঠুরীগুলোর সংকোচন হতে সময় লাগছে দশমিক এক সেকেণ্ড আর বাকি দশমিক সাত সেকেণ্ড ধরে তারা 'রিল্যাক্স' করছে মানে প্রসারিত হচ্ছে।

আর নীচের তলায় দশমিক তিন সেকেণ্ডের জন্য সংকোচন, বাকি সময়টা প্রসারণ। তাই তো?—টুম্পার চটপট উত্তর।

কিন্তু ঐ আওয়াজের ব্যাপারটা?—ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গাবলু।

হাত তুলে ছোটমামা বললো—আগে বল্ হার্টের ওপরের ঘরে কোথা থেকে রক্ত আসে?

এতো সবাই জানে।—গাবলু বললোঃ এক এক দিকে এক এক রকম! ডানদিকের অলিন্দে যত দূষিত রক্ত এসে জমা হবে বড় বড় শিরা দিয়ে। আবার বাঁদিকের ঘরে ফুসফুস থেকে অক্সিজেনওয়ালা রক্ত আসবে।

ছোটমামা বললো—হ্যাঁ। দশমিক সাত সেকেণ্ড ধরে ওপরের কামরাগুলো যখন প্রসারিত হচ্ছে, তখন ঐ ব্যাপারগুলো ঘটছে অর্থাৎ রক্ত অলিন্দে ঢুকছে। পরের দশমিক এক সেকেণ্ডে ওরা সংকুচিত হবে মানে পিচকিরির মতো ঠেলে রক্তকে পাঠিয়ে দেবে নীচের ঘরে।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—নীচের ঘরের অবস্থা তখন কি?

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ছোটমামা বললো—হুড়হুড় করে রক্ত ঢুকছে ঘরে, নীচের ঘরের সংকোচন শুরু হলো। প্রথম কাজ রক্ত ঢোকা বন্ধ করা, দড়াম্ করে দরজা বন্ধ হলো। ঐ হলো হার্টের প্রথম শব্দ।

গাবলু বললো—দরজা আবার কোনটা?

ছোটমামা বললো—কেন? যে দুটো রাস্তা দিয়ে ওপর থেকে নীচে রক্ত আসছিল, সেই অলিন্দ আর নিলয়ের মাঝের দরজার ভালভ্—তাদের শব্দ এটা। অবশ্য দরজাগুলোর নাম খট্মটে—মাইট্রাল, ট্রাইকাসপিড, এই সব।

ও, তাহলে যে 'মাইট্রাল ষ্টেনোসিস' কথাটা শুনি, সেটা এই ভালভের গণ্ডগোল?—টুম্পার জিজ্ঞাসা।

—ঠিক তাই, কোনো কারণে এই ভালভ্ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেলে ঠিক মতো কাজ করে না। তার থেকেই ঐ অসুখ। যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম; তলার ঘরে সংকোচন যতো বেশী হবে, রক্তও বাঁ-দিক থেকে মহাধমনী দিয়ে সারা শরীরে আর ডানদিক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডওয়ালা রক্ত ফুসফুসে যাবে। তাই তো? এই রাস্তার মুখে আধখানা চাঁদের মতো চেহারার ভালভ্ থাকে। নিলয়ের চাপে তারা খুলে যায়।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—তখনই কি আমরা পরের আওয়াজটা শুনতে পাই?

ছোটমামা বললো—না। যেই নীচের ঘরগুলো প্রসারিত হতে আরম্ভ

করলো, ঘরের মধ্যেকার চাপ যায় কমে। তখন মহাধমনীর রক্ত চেষ্টা করবে আবার নীচের দিকে ফিরে আসতে।

গাবলু বললো—পা পিছলে গেলে যেমন হয়।

—ঠিক বলেছিস। পেছন থেকে এই ধাক্কা খেয়ে ঐ অর্ধচন্দ্রাকার ভালভ্‌গুলো দড়াম্‌ করে বন্ধ হলো। সেটাই আমরা কানে ষ্টেথো লাগিয়ে দ্বিতীয় শব্দ হিসেবে শুনতে পাচ্ছি।

টুম্পা বললো—তাহলে আমরা হার্টের যে ধুক্‌পুক্‌ শব্দ পাই সেটা স্রেফ ভালভ্‌ বন্ধের আওয়াজ?

—আসলে আওয়াজ দুটো নয়, চারটে। বাকি দুটো সাধারণতঃ শোনা যায় না। নিলয় যখন প্রসারিত হতে আরম্ভ করে, সেইসময় রক্ত প্রথমটা হুড়মুড় করে ছোটে, সেখানেও একটা আওয়াজ হতে পারে। বাচ্চাদের বেলায় অনেক সময় এই আওয়াজটা পরিষ্কার পাওয়া যায়। এরপর নিলয়ে আস্তে আস্তে রক্ত জমা হতে থাকে, তখন কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না। নিলয়ের প্রসারণ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, উপরের ঘরে সংকোচন শুরু হয়ে যায়, ফলে রক্ত আবার হুড়মুড় করে ছোটে। এতে আর একটা আওয়াজ হয়। অবশ্য এই শেষের দুটো আওয়াজ অনেক সময়ই শোনা যায় না।

গাবলু এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো। এবার মোক্ষম প্রশ্নটি ছোটমামার দিকে ছুঁড়লো।

—যখন জানাই আছে হার্টের কোন আওয়াজ কখন শোনা যায়, অত নিবিষ্টভাবে বুকে ষ্টেথো লাগিয়ে কি অতো শোনো?

মজা তো ঐখানেই। কোনো কারণে যদি ভাল্‌ভের গণ্ডগোল হয়, বা মহাধমনী বেলুনের মতো ফুলে যায় কিংবা হার্টের মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল একটু এলোমেলো হয়ে যায় তাহলে শব্দের স্থায়িত্ব বা কিছু কিছু ধর্ম পালটে যায়। অবশ্য আজকালকার দিনে নানারকম যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে যা দিয়ে হার্টের আওয়াজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু সে-সব যন্ত্র তো আর আমাদের কাছে সব সময় থাকে না, সুতরাং একমনে ষ্টেথো লাগিয়ে আওয়াজ না শুনলে চলবে কেন বল্‌?—চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো ছোটমামা: আজ আর নয়, আর একদিন এসে জমিয়ে গল্প করা যাবে।



কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ !

গোড়াতেই গলদ !

—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মন্তব্য করলো ছোটমামা।

ভুলোকে দু-পায়ে হাঁটানোর ট্রেনিং দিচ্ছিল গাবলু, সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলো—কিসের ভুল ? কোথায় ভুল ?

হাতের বই আর প্যাকেটগুলো টেবিলের ওপর নামালো ছোটমামা।

—আগে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল চাই, রোদের ভেতর হেঁটে আসতে আসতে দম্ শেষ। তারপরে বলছি তুই ভুলটা করছিস্ কোথায়।

—ভুলটা করলাম আমি ? সেটা কিরকম হলো ?

হাত তুলে গাবলুকে থামিয়ে, টুম্পার আনা সরবতের গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করলো ছোটমামা।

—হাজার চেষ্টা করলেও তুই ভুলো কুকুরকে সমানে দু-পায়ে হাঁটাতে পারবি না !

এই ব্যাপারটা গাবলুকে একটু বুঝিয়ে বলতো।—জিভ বার করে গাবলুকে ভেংচি কাটলো টুম্পা ঃ যেহেতু সেদিন টি ভি-তে সার্কাসের কুকুরগুলো দু-পায়ে হেঁটেছে, বাবুর ধারণা হয়েছে ভুলোকে ট্রেনিং দিলে ভুলোও দু-পায়ে হাঁটবে।

—আসলে কি ব্যাপার জানিস্ গাবলু, চেষ্টা করলে ভুলো হয়তো দু-পায়ে হাঁটতে পারবে, তবে সেটা কখনই এক আধ মিনিটের বেশী নয়।

কেন ?—গাবলু-টুম্পা দু'জনেই জিজ্ঞাসা করলো একসাথে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো ছোটমামা—দেখ্, পৃথিবীর বেশীর ভাগ জীবজন্তু হাঁটে চার পায়ে। অর্থাৎ কিনা তাদের হার্ট আর ব্রেন, দুটোই থাকছে এক লেভেলে। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে হার্ট আর ব্রেন, দুটো আলাদা লেভেলে থাকছে, যেমন ধর্ আমাদের বেলায়, সেখানে ব্রেনে রক্ত পাঠাতে হার্টকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশী।

ফিক্ করে হেসে ফেললো গাবলু।—বেচারা জিরাফ, ব্রেনটা বসানো তিনতলায়! সেখানে হার্টের পরিশ্রম বেশী নিশ্চয়?

ঠিক কথা!—চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো ছোটমামা ঃ ঘাড়টা লম্বা, সুতরাং ব্রেনটা হার্টের লেভেল থেকে আড়াই-তিন মিটার উঠে গেছে! অর্থাৎ এদের হার্টকে রক্ত ঠেলতে হচ্ছে জোরে, ব্লাড-প্রেশার মানে রক্তের চাপও সে-ক্ষেত্রে বেশী।

টুম্পা বললো—আচ্ছা ছোটমামা, প্রেশারের কথা যখন উঠলোই তখন বরং জিজ্ঞাসা করি—জীবজন্তুদের রক্তচাপ কি রকম হয় তার কোন আন্দাজ আছে তোমার?

টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর মধ্যে থেকে একটা পাতলা বই তুলে নিয়ে পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললো ছোটমামা—

এই দেখ্, জীবজন্তুদের রক্তচাপের হিসেব। মানুষের রক্তচাপ গড়ে দেড়শো মিলিমিটার পারদ চাপের সমান, ব্যাঙের ৩০ থেকে ৪০ মিলিমিটার, অক্টোপাসের ৬০, ইঁদুরের ৭৫, হাতী এবং ঘোড়ার ২০০, জিরাফ ২৫০—এমন কি পোকামাকড়দের লার্ভার ভেতরকার তরল পদার্থটার চাপও মেপে ফেলা হয়েছে। প্রায় ৩১ মিলিমিটার।

বিজ্ঞানীদের বোধহয় কোন কাজ ছিলো না, তা না হলে ঐসব এলেবেলে পোকামাকড়, গেঁড়ী-গুগলীদের রক্তচাপ কেউ মাপে?—মুখ বাঁকালো গাবলু।

গভীর বিতর্কের ব্যাপার।—চশমার ফাঁক দিয়ে মিট্‌মিট্ করে তাকালো ছোটমামা ঃ তবে এই রক্তচাপ প্রাণিজগতের কতজনকে বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে, তার খোঁজ আর ক'জন রাখে?

গভীর রহস্যের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে?—জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ছোটমামার মুখের দিকে তাকালো গাবলু।

কাগজের টুকরো পাকিয়ে কানে শুড়শুড়ি দিতে দিতে ছোটমামা বললো—জানিস্ কি, তারামাছ, মানে 'স্টারফিসেরা' হাইপ্রেশারে ভোগে? আর ভোগে বলেই বাঁচোয়া, না হলে 'নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু' হয়ে ওদের থেবড়ে বসে থাকতে হতো!

—ব্যাপারটা কি খুলে বলবে তো?

পায়ে পায়ে সত্যবাবু কখন যে ঘরে ঢুকেছেন, খেয়ালই করে নি কেউ।

চায়ের তম্বিরে টুম্পাকে ভেতরে পাঠালো ছোটমামা।—আসলে মানুষই শুধু হাই-প্রেশারের চিন্তায় রাত্রে ঘুমোয় না। জীবজগতে বহু প্রাণী আছে যাদের রক্তচাপের ঝামেলা সময় সময় তাদের পক্ষে বাড়তি সুযোগও করে দেয়।

গাবলু বললো—নট্ নড়নচড়ন ব্যাপারটা কি বললে না তো?

—স্টার ফিস দেখেছিস্ তো? এরা কিন্তু আসলে মাছ নয়, সাগরশশার

জাতভাই। এই স্টার ফিশদের উল্টে ফেললে দেখতে পাবি তারার পাঁচটা হাত বরাবর জল যাবার নালা কাটা আছে। নালার আবার ছোট ছোট শাখা আছে, সেগুলো গিয়ে ঢুকেছে ক্ষুদে ক্ষুদে 'টিউব-ফুটে'র ভেতর।

সত্যবাবু বললেন—'টিউব-ফুট' কি?

—ওগুলোই তো ওদের পা। স্টারফিসের প্রত্যেক বাহুর নীচে অসংখ্য টিউব-ফুট, পায়ের সংখ্যা গুণে শেষ করা মুস্কিল।

—অতো পায়ের দরকারটা কি ছোটমামা?

—মজাটাই তো ঐখানে। এমনিতে এই পাগুলো লট্‌পট্‌ করে ঝুলতে থাকে। যেই দরকার পড়লো, নালা থেকে হাই-প্রেশারে জল এসে ঢোকে পা-গুলোয়। ব্যাস্‌। পাগুলো তখন ক্ষুদে বেলুনের চেহারা নিলো—তার ওপর ভর দিয়ে 'স্টারফিস্‌ মশাই' উঠে দাঁড়ালেন। পর মুহূর্তে নালা থেকে জল পাম্প করে পাঠানো হলো পরের হাতে। সেখানে টিউব-ফিটগুলো যেই বেলুন হয়ে গেল, আগের বেলুনগুলো তখনি জল বেরিয়ে আবার লট্‌পটে। মানে শরীরের ভরটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান হয়ে গেল। এইভাবে হাতের ওপর ভর দিয়ে চলতে আর অসুবিধে কি?

গাবলু বললো—মজা তো মন্দ নয়?

ছোটমামা হাসলো।—হাই-প্রেশারকে বহু জীবজন্তু সুবিধেমতো নানা কাজে লাগাচ্ছে। ধর্‌, কেঁচোর কাজ শক্ত পাথুরে মাটিকে উর্বর করা। সেখানেও একই কায়দা। মাটির মধ্যে ছোট্ট একটু ফাঁক পেলেন কি ব্যাস্‌। মাথাটা শুধু গলিয়ে দেবার ওয়াস্তা। শরীরের সামনের দিকের 'সারকুলার মাসল্‌গুলো' সংকুচিত হয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে সেই বাড়তি রক্ত ঠেলে পাঠাবে মাথায়। মাথা তখন ফুলে এক্কেবারে শক্ত দুরমুশ। মাটি পিটিয়ে ছাতু করে ছাড়বে।

টুম্পা ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললো—বলো কি? ঐ রবারের মতো কেঁচোর মাথায় এত জোর?

—হুঁ, হুঁ। কতটা জোর, তারও একটা হিসেব করা হয়েছে। এমনিতে কেঁচোর রক্তচাপ দু মিলিমিটার।

টুম্পা বললো—এতো কম?

—সে তো বটেই। দু মিলিমিটার জলের চাপের সমান। কীট-পতঙ্গদের রক্তচাপ জলের চাপের সাপেক্ষে মাপা হয়, আমাদের মতো পারদ চাপের হিসেব নয়। এখন এই দু-মিলিমিটার চাপকে বাড়িয়ে ওরা চোদ্দ-মিলিমিটার পর্যন্ত করতে পারে, এতে মাথার গুঁতোর জোরটাও বাড়ে, তখন প্রতিবারে সাড়ে আট গ্রাম ওজনের জোর নিয়ে ওরা মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকে।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে দেখা যাচ্ছে স্রেফ প্রেশার বাড়িয়ে কেউ মাটিতে

গর্ত খুঁড়ছে কেউ আবার এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় চলে যাচ্ছে? ভাবতেও অবাক লাগে!

সত্যবাবুর দিকে তাকালো ছোটমামা—শুধু তাই নয়। আরো আছে।

দক্ষিণ আমেরিকাতে এক ধরণের শিং-ওয়ালা ব্যাঙ দেখা যায়। এরা আসলে ব্যাঙ নয়, গিরগিটির জাতভাই সরীসৃপ। এদের শরীরে বিশেষ একটি পেশী আছে যার নাম 'অবটুরেটর্ মাস্ল'। এটাকে এরা ইচ্ছে মতো সংকুচিত করতে পারে।

তাতে লাভ?—হাই তুললো গাবলু।

—এই পেশীটা সংকুচিত হলে যে রক্তবহা নালীটা চোখে রক্তের যোগান দিচ্ছে, তাতে রক্ত চলাচল যাবে বেড়ে। যখন কোনো শত্রু কাছাকাছি এসে পড়ে, এরা প্রথমে 'অবটুরেটর মাস্‌লে' অল্প চাপ দিয়ে চোখে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নেয়। চোখ তখন ড্যাবড্যাবা রক্তবর্ণ। ভাবটা যেন, এগিয়েছো তো খুব খারাপ হয়ে যাবে! তফাৎ যাও! এতে দুষমন পালালো তো ভালো, কিন্তু কেউ যদি তারপরেও এগিয়ে আসে, ওরা মাসলে চাপ আরো বাড়ায়। চোখের পাতলা 'নিকটিটেটিং মেমব্রেন' সে চাপ সইতে পারবে কি করে?

গাবলু বললো—কি নামটা বললে যেন?

—আরে বাবা, ওর নাম 'উপ-পল্লব'। বাড়ির পোষা টিয়াপাখীটার চোখের দিকে নজর করিস্। ওদের তো আর চোখের পাতা নেই, দেখবি একটা স্বচ্ছ পর্দা চোখের পাতার মতো পিট্ পিট্ করে।

রক্তচাপে ঐ শিং-ওয়ালা ব্যাঙেদের চোখের পর্দা ফেটে যায় নাকি?—টুম্পার জিজ্ঞাসা।

—যায়ই তো! ওখান থেকে পিচ্‌কিরির মতো রক্ত ছিট্‌কে লাগে শত্রুর মুখে। সে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘাবড়ে যেতেই ইনি সে সুযোগে দে চম্পট!

শিউরে উঠে সত্যবাবু বললেন—কি ভয়ংকর!

—হ্যাঁ, এ পিচ্‌কিরির ফোয়ারা দেড়-মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। বুঝুন একবার! তবে এদের সব থেকে মজার ব্যাপার হলো যে, এই 'অবটুরেটর মাসল্' আছে বলেই এরা বছর বছর জামা পালটায়।

ভ্রূ কোঁচকালো গাবলু—গিরগিটির আবার জামা কি?

মুচকি হাসলো ছোটমামা।—এরই নাম 'মোলটিং' বা খোলস ছাড়া। ঐ মাসল্‌টাতে বিশেষভাবে চাপ দিলে মাথার ওপরের চামড়ার রক্তনালীগুলো একসাথে ফাটিয়ে ফেলা সম্ভব। ফলে চামড়াটা যায় ছিঁড়ে। শিংওয়ালা ব্যাঙমশাইও সেই ফাঁক দিয়ে গটগটিয়ে বেরিয়ে আসেন।

টুম্পা গম্ভীর মুখে বললো—একেবারে শিব্রাম্ চক্রবর্তীর গল্প। সেই যে গো, শিকারী মশাই গাছের সাথে বাঘের লেজ বেঁধে মাথার চামড়াটা ব্লেড দিয়ে চিরে দিতেই বাঘ-বাবাজী চামড়া ফেলে দে চম্পট!

টুম্পার কথায় হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে সবাই।

হাসি থামলে গাবলু বলে ওঠে—তাহলে ঐ শিং-ওয়ালা ব্যাঙেদের হার্টের জোর খুব বলো? দেড়-দু মিটার দূরে পিচকিরির মতো রক্ত ছুঁড়তে তো জবরদস্ত পাম্প দরকার?

—সে তো বটেই। ছোটমামা বলে উঠলো: ছোটখাট প্রাণীদের হার্ট কাজ করে বড় প্রাণীদের হার্টের তুলনায় অনেক বেশী!

—যাঃ তা হয় না কি? একজন মানুষের হার্টের তুলনায় একটা ব্যাঙের হার্ট বেশী কাজ করবে কি করে?

দ্যাখ্, মানুষের হার্টের যা আয়তন, সে তুলনায় ব্যাঙের হার্ট অন্ততঃ একশো গুণ ছোটো।—বলে ওঠে ছোটমামা: এমনিতে দেখলে মনে হয় মানুষের হার্টটাই যেন বেশী কাজ করছে। কিন্তু হিসেবটা করতে হবে একটু অন্যভাবে। যে কোন দু-জনকেই একটা 'স্কেলে' ফেলে দেখতে হবে।

—অর্থাৎ?

—মানে হলো, প্রথমেই হিসেব করে দেখতে হবে মানুষের হার্টের একগ্রাম 'টিস্যু' কতটা কাজ করেছে, তার সঙ্গে তুলনা করতে হবে ব্যাঙের একগ্রাম হার্টের কাজ করার ক্ষমতাকে। যেমন ধর্, আমাদের প্রতি গ্রাম 'হার্ট টিস্যু' প্রতি মিনিটে চারহাজার গ্রাম সেণ্টিমিটার কাজ করছে। ঠিক একই পরিমাণ কাজ করছে একটা শামুকের একগ্রাম 'হার্ট-টিস্যু' প্রতি মিনিটে।

গাবলু বললো—বলো কি?

—সব থেকে দুঃখের কথা হলো একটা ব্যাঙের হার্টও সবসময় আমাদের হার্টের তিনগুণ বেশী কাজ করছে। ভুলো-কুকুরের হার্ট তোর থেকে পাঁচগুণ বেশী কাজ করছে, একটা ইঁদুরের হার্ট—বারোগুণ বেশী! সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারে আমরা জীবজগতের লাষ্ট বেঞ্চে বসে আছি।

টুম্পা বললো—বাব্বা! হার্টের কাজ করার ক্ষমতার কথা শুনে মনে হচ্ছে দু-পেয়ে না হয়ে চারপেয়ে হলেই বোধহয় ভালো হতো!

—কথাটা নেহাত মন্দ বলিস নি! তবে গণ্ডগোলটা হবে যদি চারপেয়েদের দু-পেয়ে হবার শখ জাগে।

—কেন?

হার্ট আর ব্রেন এক লেভেলে থাকার দরুণ ওদের হার্ট ঐ ভাবেই কাজ করে অভ্যস্ত। চারপেয়েরা হঠাৎ দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে, হার্ট রক্তকে ঠেলে ব্রেনে

পাঠাতে পারবে না। আর ব্রেনে মিনিটখানেক রক্ত না গেলে ফলটা বুঝতেই পারছিস্—অক্সিজেনের অভাব, পতন ও মূর্চ্ছা। সুতরাং ভুলোকে একটানা বেশীক্ষণ ট্রেনিং না দেওয়াই ভালো। তবে হ্যাঁ, টুম্পা তুই যে বললি চারপেয়ে হলে ভালো হতো, তার সপক্ষে কিন্তু খুব সুন্দর যুক্তি আছে।

জিজ্ঞাসুভাবে ছোটমামার মুখের দিকে তাকালেন সত্যবাবু।

—দু'পেয়ে হলেই ব্রেনে রক্ত পাঠানোর জন্য রক্তচাপ বেশী হবে, আর রক্তচাপ বেশী হলেই সেই থেকে রক্তনালী ফেটে যেতে পারে—যার ডাক্তারী নাম হলো 'ইনটারন্যাল হেমারেজ'।—অবশ্য রক্তচাপ যাতে হঠাৎ বেড়ে না যায় তার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে 'রেগুলেটর'-ও আছে।

এখানেও রেগুলেটর?—চোখ কপালে তুললো গাবলু: এক 'রেগুলেটর' তো বাবার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তার ওপর তুমিও আবার রেগুলেটরের কথা বলছো?

ছোটমামা একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললো—কি ব্যাপার?

মুচ্‌কি হাসলো টুম্পা—বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো না?

চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে সত্যবাবু বললেন—এখন সকলের ধান্ধা কি করে লোক ঠকাবে। ঐ রেগুলেটর নিয়ে বিষ্টু আমাকে কম বিপাকে ফেলেছে?

—বিষ্টু......নামটা যেন চেনা লাগছে?

—আরে, খবরের কাগজে হামেশাই বিজ্ঞাপন দেয় না, 'সমুদ্র-সৈকতে' কোম্পানীর পাখা, সাত বছরের গ্যারাণ্টি? ঐ 'সমুদ্র-সৈকতে' হচ্ছে বিষ্টুর কোম্পানী। ফ্যান যে খারাপ তৈরী করছে তাও না।

—তবে?

—একটা অফিসে কিছু ফ্যান কেনার দরকার ছিল, আমি বিষ্টুর কোম্পানীর নাম সুপারিশ করলাম। চল্লিশটা পাখা দিয়েছে, অথচ সবক'টার রেগুলেটর খারাপ। মাঝখান থেকে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে বলো দেখি? এখন বিষ্টুর জোচ্চুরিটা হচ্ছে যে—ও ফ্যানের জন্য সাত বছরের গ্যারাণ্টি দিয়েছে কিন্তু গ্যারাণ্টির আওতা থেকে 'রেগুলেটর' বাদ!

মাথা চুলকালো ছোটমামা।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। রেগুলেটর না হলে আসল যন্ত্রটার কোন দামই থাকে না।

পাশ থেকে টুম্পা বললো—যেমন ধরো আমাদের রক্তচাপের রেগুলেটর, তাই না ছোটমামা? তুমি তো এ নিয়ে আমাদের বলছিলে?

রাগতভাবে সত্যবাবু বললেন—আমার ঐ রেগুলেটরটা খুব ভাল কি না,

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে। বিন্টুর ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার 'প্রেশার' বেড়ে গেছে। তুমি একবার প্রেশারটা দেখে দিও তো ?

সত্যবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল রাগটা মোটেই পড়েনি।

টুম্পা বললো—এখন মাপলে তোমার প্রেশার বেশী থাকবেই। বিন্টুর কথা শুনে যেরকম রেগে উঠলে !

—কথাটা টুম্পা ভুল বলেনি। বলে উঠলো ছোটমামা ঃ রাগ কম যাদের—তাদের ব্লাড-প্রেশার কথায় কথায় উপরের দিকে ওঠে না। পুরাণের গল্পে দেখুন না, মুনি-ঋষিরা সকলকে উপদেশ দিতেন—'জিতেন্দ্রিয় হও', অথচ অধিকাংশ বাবাঠাকুরদের 'ক্রোধ' রিপুটির ওপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আসলে সে যুগে সব হাই-প্রেশারের রোগী ছিল। আর হবে না-ই বা কেন ? সারাজীবন তপস্যা আর খাওয়া বলতে স্রেফ দুধ আর ঘি—প্রেশারের আর দোষ কি ? আর তাঁরা সব দেহ রাখতেন 'সন্ন্যাস' রোগে।

গাবলু বললো—তুমি কি করে জানলে কি ভাবে তাঁরা মারা যেতেন ?

—আরে বাবা, সন্ন্যাসীরা যে রোগে মরে তার নামই 'সন্ন্যাস' রোগ ! অর্থাৎ এখনকার দিনের 'ইনটারন্যাল হেমারেজ'। অবশ্য আজকাল আর সন্ন্যাসীদের 'সন্ন্যাস' রোগ হয় না, দুধ-ঘি বরাতে জুটছে কই ? উল্টে গৃহীরাই এখন 'সন্ন্যাস' রোগে মরছে, বিশেষতঃ গদীতে বসে যারা 'বেওসা' করছে আর মনের সুখে দুধ-ঘি, রসগোল্লা, সন্দেশ, পোলাও, কালিয়া.........

সত্যবাবু বললেন—ব্যাস্। ব্যাস্ ! আর না। যে-সব জিনিসগুলো আমি খেতে ভালোবাসি অথচ এরা কিছুতেই আমাকে খেতে দেবে না, সেই সব জিনিসের নাম করা চলবে না। কিন্তু এই তেল-ঘি, পোলাও-কালিয়ার ওপর তোমরা, মানে ডাক্তাররা খড়্গহস্ত কেন বলো দেখি ?

খুব সোজা। তেল-ঘি খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়বে, সেগুলো গিয়ে রক্তনালীর গায়ে জমে দেওয়ালটা শক্ত করে দেবে, ঘটবে নানা বিপত্তি।—জবাব দেয় টুম্পা।

ছোটমামা চেয়ার থেকে উঠে ফ্যানের রেগুলেটরটা এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে এলো।

—যদি কোন কারণে শরীরের কোন অংশে রক্ত-চলাচলের মাত্রাটা বেড়ে যায়, যেমন ধর্ বিন্টুবাবুর ব্যাপারে তোর বাবার মুখ আর মাথার দিকে রক্ত বেশী যাচ্ছিল, তখন অজান্তেই কিন্তু দুটো ব্যাপার ঘটে যাচ্ছিল—হার্ট বেশী জোরে পাম্প করছিলো যাতে বেশী রক্ত সেই দিকে যেতে পারে আর শরীরের বাকি অংশে রক্ত-চলাচল গিয়েছিলো কমে, যাতে রক্তটা সেই দিকে না গিয়ে মাথার দিকে ছোটে।

সেই জন্যই বোধ হয় বলে 'রাগলে মাথায় খুন চেপে যায়'—পাশ থেকে গাবলু বলে উঠলো ঃ হিন্দীতে 'খুন' মানে তো রক্ত ?

ভবিষ্যতে তুই একটা 'জিনিয়াস' হবি মনে হচ্ছে !—সস্নেহে গাবলুর দিকে তাকাল ছোটমামা ঃ যাতে না 'খুন' চড়ে যায়, তার জন্যেই তো রেগুলেটর আছে।

সত্যবাবু এতক্ষণ চোখ বুঁজে কথাবার্তা শুনছিলেন। চোখ না খুলেই বললেন—তা এই রেগুলেটরটি বসানো আছে কোথায় ?

ছোটমামা বললো—রেগুলেটর তো একটি নয়, একাধিক। প্রেশার ঠিক রাখার জন্য রক্তনালীর দেওয়ালে কোন কোন জায়গায় বিশেষ কতকগুলো ব্যবস্থা আছে। এগুলো একধরণের রক্তচাপের রেগুলেটর বা 'ব্যারোরিসেপ্টার' !

এগুলো সব রক্তনালীর দেওয়ালেই আছে ?—প্রশ্ন করে টুম্পা।

—আসলে যেগুলো বেশী দরকারী রেগুলেটর, তারা থাকে হার্ট থেকে বেরিয়ে আসা মহাধমনীর ভেতরের দেওয়ালে, আর যে রাস্তা দিয়ে রক্ত মাথায় চড়ে, সেই 'ক্যারোটিড' ধমনীতে। রক্তচাপ বেড়ে গেলে সেই ধাক্কা গিয়ে পড়বে 'ব্যারোরিসেপ্টারে'—অমনি শুরু হয়ে যাবে 'টরে-টক্কা' !

সত্যবাবু বললেন—'টরে-টক্কা', মানে ?

ছোটমামা হেসে ফেললো।—'টরে-টক্কা' মানে 'টেলিগ্রাফিক' ব্যবস্থা। রেগুলেটর থেকে নার্ভ দিয়ে খবর চলে গেল 'ব্রেনে'র বিশেষ কিছু অংশে—'রক্তচাপ বাড়ছে'। হেড অফিস তার উত্তরে অন্য কতকগুলো নার্ভ দিয়ে হার্ট আর রক্তনালীগুলোকে খবর পাঠালো—'অবস্থা সামলাও'! হার্ট তার চলার গতি কমাবে, রক্তনালীগুলো তাদের দেওয়ালের মাসল্গুলো ঢিলে দেবে ফলে রক্তনালীর দেওয়ালে রক্ত কম ধাক্কা দিতে দিতে যাবে, মোটমাট সব মিলে রক্তচাপ কমবে। তবে হ্যাঁ—এই রেগুলেটরও একটা 'রেঞ্জে'র মধ্যে কাজটা ভালোভাবে করে। কুকুরজাতীয় প্রাণীদের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে এই 'রেঞ্জটা' হচ্ছে ষাট থেকে দেড়'শো মিলিমিটার পারদচাপের মতো !

টুম্পা বললো—কিন্তু যদি হঠাৎ করে প্রেশার কমে যায় ? তখন ?

—এখানেও কাজটা একই ধরণের হবে, তবে উল্টো ভাবে। কেউ যদি হঠাৎ ভয় পায়, ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে। যেমন ধর্, রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। যারা একটু ভীতু ধরণের লোক, তাদের অ্যাকসিডেন্টের ঘটনা চোখে পড়লে শরীর আনচান্ করতে থাকে, জিভ শুকিয়ে আসে—এমনি নানা উপসর্গ। আসলে ঝট্ করে প্রেশার কমে বলেই এই বিপত্তি। একটু বসে জিরিয়ে নিলে আবার সব ঠিকঠাক্। এখানেও সেই টরে-টক্কার ব্যাপার,

সঙ্গে কয়েকটা হরমোনও কাজ করতে শুরু করবে। যেমন, বিশেষ কয়েকটা নার্ভের নির্দেশে 'কিডনী'র মাথায় লাগানো 'অ্যাডরেনাল গ্ল্যাণ্ড' বিশেষ কিছু হরমোন রক্তে মেশাবে যারা হার্টের ধুক্‌পুকুনি বাড়িয়ে দেবে। তাছাড়াও যদি কোনভাবে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে বা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলেও ঐ 'স্বয়ংক্রিয় টরে-টক্কা' চালু হয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়।

—ঠিক যেমনটি হয় সিনেমা হলে বসে একটানা তিনঘণ্টা কাটালে। এই কারণে আমি পারতপক্ষে সিনেমা হলের রাস্তাও মাড়াই না।

চটি ফট্‌ফটিয়ে সত্যবাবু পাশের ঘরে উঠে গেলেন।—একটু বসো, সুনীলের লেখা প্রেসক্রিপশনটা আনছি। আমার প্রেশার এখন বাড়তির দিকে।



ময়রা নিজে কি মিষ্টি খায় ?

সত্যবাবু ঘরে ঢুকতেই হতাশভাবে হাত ওলটালো ছোটমামা—ছুটির দিনের সকাল, কোথায় ভাবলাম একটু দাবা খেলবো আপনার সঙ্গে, তা না আপনি হাতে 'প্রেসক্রিপশন' ধরিয়ে দিচ্ছেন ?

—বটে ? তুমি আমার সঙ্গে দাবায় বসবে ? সোৎসাহে ছোটমামার সামনের চেয়ার দখল করলেন সত্যবাবু : হারার পর সারাদিন মনমরা হয়ে থাকবে না তো ? রাজি থাকো তো বলো—

ছোটমামা বললো—ঠিক আছে। গাবলু, ছকটা নামা তো ? যদি হারি—বাজি রইলো, প্রতি সপ্তাহে এখানে এসে আপনার প্রেশার মেপে দিয়ে যাবো !

বেশ।—গুটি সাজাতে শুরু করলেন সত্যবাবু : হারলেও অন্ততঃ আজকে প্রেশারটা দেখে দিও।

ছোটমামা বোড়েটা এগিয়ে দিলো গম্ভীরভাবে—মাভৈ, 'স্ফিগমো ম্যানোমিটার' সঙ্গেই আছে।

খানিকটা যেন চমকে গিয়ে সত্যবাবু বললেন—কি ?

নৌকোটা সামনাসামনি এগিয়ে দিয়ে ছোটমামা বললো—প্রেসার মাপার যন্ত্র। রাজারা যেমন মন্ত্রী ছাড়া অচল। 'স্ফিগমোম্যানোমিটার' ছাড়া ডাক্তারদের অবস্থাও তাই।

আমার নৌকোটা এই একঘর সরালাম, এবার দেখি তোমার মন্ত্রী বাঁচে কি করে।—পরম উৎসাহে নড়েচড়ে বসলেন সত্যবাবু।

নির্লিপ্তভাবে ছকের দিকে তাকালো ছোটমামা—এ ধরণের চালের কোন মানে হয় না। নৌকোটা সরলে তার ফাঁক দিয়ে ঢুকে আপনার গজ বাহিনী ধ্বংস করা কঠিন না। বুঝে শুনে চাল দিন।

সত্যবাবু হাসলেন।—তোমার কথাবার্তা শিব্রাম চক্রবর্তীর সেই ডাক্তার বন্ধুর মতো শোনাচ্ছে যে ?

গল্পের গন্ধে গাবলু-টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—সেটা কোন গল্প ?

আমিই বলছি। ছোটমামা বললো ঃ খেলার সময় কথা বলে প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোবল নষ্ট করে দেওয়ার কায়দা আর কি! সেই ডাক্তার বন্ধু অন্য খেলোয়াড়দের নিজের বাড়ীতে টেবিল-টেনিস খেলতে ডেকে আনতো।

গাবলু বললো—তারপর?

—তারপরে খেলা শুরু হতো। ডাক্তারের বাড়ী, পাশের র‍্যাকে জারভর্তি সব 'হার্ট,' 'ফুসফুস', 'কিডনী' সাজানো। খেলা চলতে চলতে সেই ডাক্তার হয়তো বললো ঃ ঐ যে লিভারটা দেখছো সেটার মালিক দিনে তিরিশ কাপ চা খেতো, ঠিক তোমার মতো! আজ তার কি হাল হয়েছে দ্যাখো! টেবিলের ওপাশে যে দাঁড়িয়ে, তখন সে ভাবতে শুরু করলো—ঠিকই তো, এতো চা খাওয়া উচিত হচ্ছে কি? ইতিমধ্যে ডাক্তার কিন্তু খেলাটা জিতে নিয়েছে।

চালাকির একশেষ!—মন্তব্য করে টুম্পা।

—দাবা খেলাতেও যে এই ব্যাপারগুলো হয় তোরা বোধ হয় খবরের কাগজে পড়েছিস্। করোপভ-করশনয়ের খেলায় টেবিলের নীচে পার্টিশন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, যাতে না একজনের পায়ে অপরের পা লেগে মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা ধর 'রিফেক্টার' চশমা, যা দিয়ে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে আলো ফেলা যায়। তোদের বাবার ধারণা, আমিও সেই কায়দায় ওঁকে হারাবার তালে আছি!

সত্যবাবু বললেন—না হে না। অতো সহজ নয়। আমি নিজেকে সবল চিত্তের মানুষ বলে মনে করি, ওসব কথায় ভুলছি না!

গাবলু এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা ছোটমামা, শুনেছি ববি ফিশার নাকি খেলার সময় এমন কোন হোটেলে থাকে না যেখানে 'সুইমিং পুল' নেই। সাঁতার কাটলে কি মনঃ সংযোগের ক্ষমতা বাড়ে?

'বোড়ে'টা একঘর এগিয়ে দিতে দিতে ছোটমামা বললো—সাঁতার কাটলে হার্টের 'এফিসিয়েন্সী' মানে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে, হার্টের এফিসিয়েন্সী বাড়লে ব্রেনে রক্ত-চলাচল বাড়ে, ব্রেনে রক্ত-চলাচল বেশী হলে বুদ্ধি বাড়ে, মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে, যার ফলে এই নৌকোটা তুলে নিলাম।

আমি দেখেছি সব ব্যাপারেই তুমি হার্টকে এনে ফেল।—টুম্পা হাই তুললো ঃ আচ্ছা, সারা শরীরে রক্ত জোগাচ্ছে হার্ট, কিন্তু হার্টকে রক্ত জোগাচ্ছে কে? মানে আমি বলতে চাইছি হার্টের দেওয়ালের মধ্যেও কি রক্ত-চলাচলের ব্যবস্থা আছে?

গম্ভীর মুখে সত্যবাবুর একটা বোড়ে তুলতে তুলতে ছোটমামা বললো—বোড়ে বা সৈন্যবাহিনীই হচ্ছে আসল শক্তি, কি বলেন? নেপোলিয়ান একবার

বলেছিলেন : The way to a Soldier's heart is through the Stomach—অর্থাৎ সৈন্যদের মারতে হলে তাদের ভাতে মারতে হবে। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ করলে মানে দাঁড়ায়, 'হার্টে পোঁছোতে হলে পেট দিয়ে ঢুকতে হবে।'

টুম্পা বললো—কিছ্ছু বুঝলাম না।

মন্ত্রীটা এক ঘর ডান পাশে সরিয়ে দিলো ছোটমামা।—শামুকদের ব্যাপারটা কিন্তু তাই। অন্ত্রের নলটা সোজা হার্ট ফুটো করে চলে গেছে। এতে সুবিধে হচ্ছে যে হার্টের পেশীগুলো সরাসরি খাবার জোগান পেয়ে যাচ্ছে। মাছ বা ব্যাঙ, এদের হার্টের পেশীগুলো পাতলা, ফলে হার্টের মধ্যে দিয়ে রক্ত যাতায়াত করার সময়ই পেশীগুলো খাবার আর অক্সিজেন পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের বেলায় হার্টের আলাদা খাতির।

'আলাদা খাতির', ব্যাপারটা কি ?—টুম্পা একটু নড়েচড়ে বসে।

—হার্টের পেশীতে রক্ত চলাচলের জন্য বিশেষ রক্তনালী আছে, যাদের নাম 'করোনারী ধমনী'। হার্টের থেকে যে মহাধমনী বেরুচ্ছে, ঠিক তার গোড়া থেকে একজোড়া করোনারী ধমনী বেরিয়ে সারা হার্টের দেওয়ালে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে গেছে। মজাটা হচ্ছে তাবৎ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগের হার্টে ডানদিককার করোনারী ধমনী আর তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে বেশী রক্ত চলাচল করে, বিশ ভাগ মানুষের হার্টে বাঁ-দিকের করোনারী ধমনী বেশী জোরদার, আর তিরিশ ভাগ মানুষের হার্টে দুটোই সমান। এই শেষের দলের হার্টটাই বেশী জোরালো, ডান-বাঁ দুটো সমান হওয়ায় হার্টের অসুখবিসুখ হবার সম্ভাবনাও কম।

টুম্পা বললো—রক্তটা কিভাবে যাচ্ছে তা তো বুঝলাম। কিন্তু হার্টের মধ্যে সেটা আবার ফিরছে কি করে ?

গজটাকে কোনাকুনিভাবে নিজের নৌকার সামনে ফিরিয়ে আনলো ছোটমামা।

—অনেক রাস্তা আছে। হার্টের দেওয়ালের পাশের দিকের রক্ত শিরা দিয়ে ডান অলিন্দে ফিরতে পারে, আবার কতকগুলো জায়গা থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট রক্তজালক মারফৎ রক্ত এসে জমা হয় একটা জায়গায়। একে বলা যায় 'সাইনাস' বা হ্রদ। এখান থেকেও রক্ত অলিন্দে ফিরে যায়। এছাড়াও 'ডিপ-ভেনাস সিস্টেম' বলে একটা ব্যাপার আছে। এটা দিয়ে দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গাগুলো থেকে রক্ত বিশেষ কয়েকটা শিরা দিয়ে অলিন্দে ফিরে যায়। এমনি সময়ে এই 'ডিপ সিস্টেম' দিয়ে শতকরা মাত্র দশ পনেরো ভাগ রক্ত অলিন্দে ফিরে যায়, কিন্তু বিপদের সময় এরা যথেষ্ট দরকারী। করোনারী ধমনীতে যদি রক্ত জমাট বেঁধে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই 'ডিপ-সিস্টেম' দিয়ে অলিন্দ থেকে রক্ত সরাসরি হার্টের দেওয়ালে গিয়ে অবস্থা সামাল দেবে। আবার হার্টের শিরা

যদি কখনও সংকুচিত হয়ে আটকে যায়, এই রাস্তা দিয়েই রক্ত অলিন্দে ফিরে যাবে। ঠিক যেন বড় রাস্তার পাশাপাশি ছোট রাস্তা। বড় রাস্তায় গাড়িঘোড়া আটকে গেলে ছোট রাস্তা দিয়েই গাড়ি যাবে যাতে 'ট্র্যাফিক জ্যাম' না হয়।

টুম্পা মুচকি হেসে বললো—হার্টের দেওয়ালে 'ট্র্যাফিক প্রেসার' কতো?

—খুব কম নয়। জানিস্ তো পেশী মাত্রই চুলের মতো সরু সরু 'ফাইবারে'র সমষ্টি? হার্টের প্রত্যেকটি ফাইবারে একটি করে রক্তজালকের শাখা গেছে। ফলে বুঝতেই পারছিস্ হার্টের দেওয়ালের মধ্যে রক্ত চলাচলের হার কতো বেশী?

সত্যবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—জন পিছু এক একটা রক্ষী। তোমার এই অশ্বমেধ ঘোড়াটার কোন রক্ষী না থাকায় এবার এটাকে বধ করলাম!

দীর্ঘশ্বাস ফেললো গাবলু।—ঘোড়াটা গেল। ছোটমামা, প্রতিপক্ষ বেশ চাপে ফেলেছে মনে হচ্ছে।

—চাপে পড়া ভাল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ছকের ওপর নজর বোলাতে বোলাতে ছোটমামা বললো: চাপে পড়লে করোনারী ধমনী দিয়ে রক্ত চলাচল বাড়ে। হার্টের নিচ তলায় মানে নিলয়ে চাপ বাড়লে এই ঘটনা ঘটবে। যেমন ধর্, হার্টের ভাল্‌ভের গণ্ডগোলে ডানদিককার নিলয়ে চাপ বেড়ে গেলো, কিংবা রক্তবহা নালীগুলোতে কোলেস্টেরল জমে রক্ত চলাচলের রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো। তখনই কিন্তু সাবধান। বাঁ-দিকের নিলয়ের কাজের চাপ বাড়লো।

টুম্পা, তোর বাবাকে সাবধান হতে বল্। একে কোলেস্টেরল বেশী, তার ওপর রাজা বিপন্ন। বেশী কাজ করতে করতে হার্টের পেশীগুলো ঢিলে হয়ে গেলে করোনারী ধমনী দিয়ে রক্ত চলাচল কমবে। এরও পূর্বাভাষ কিন্তু পাওয়া যেতে পারে।

ছক থেকে নজর সরালেন সত্যবাবু।—কি রকম?

—খাওয়ার পর বা জোরে হাঁটার সময় বুকে চাপ ধরা বা একটা চিনচিনে ব্যথা বুক থেকে কাঁধে ছড়িয়ে যাচ্ছে, যাকে বলে 'অ্যানজাইনা পেন,' এটা কিন্তু বিপদের সংকেত। এদিকে রাজারও বিপদ ঘনিয়ে আসছে, অর্ধেকের বেশী সৈন্য সামন্ত কিন্তু তুলে নিয়েছি।

সত্যবাবু বললেন—হুঁ।

—করোনারী ধমনী দিয়ে রক্ত চলাচল কমলে হার্টের পেশী পুষ্টি পাবে কম, শেষে তারা নষ্ট হয়ে যেতে থাকবে। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে মন্ত্রীটাকে দু-ঘর এগোলাম। আপনার রাজার আর নড়বার জায়গা নেই। সুতরাং এর ফল একটাই; 'কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর' কিংবা কিস্তিমাৎ!

হতাশ হয়ে সত্যবাবু বললেন—অন্যমনস্ক করে জিতলে। এবার বরং 'প্রেসক্রিপশন'টা দেখো।

বিশেষ চিন্তিত হবার মতো কিছু তো দেখছি না।—প্রেসক্রিপশনের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলে উঠলো ছোটমামা : প্রেসারটা শুধু একটু বেশীর দিকে।

—আসলে ঐ ভয় আর দুশ্চিন্তার জন্য দায়ী তোমরাই, মানে ডাক্তাররা। কালকে সুনীল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, বলে কিনা আমাকে ফলের রস, মাখন তোলা দুধ, তরকারি সেদ্ধ, এই সব খেতে হবে। একগাদা ওষুধপত্র লিখেছে আবার বলেছে একটু 'ই. সি. জি.'-টাও করিয়ে নিন। এসব শুনলে দুশ্চিন্তা কমবে না বাড়বে?

টুম্পা বললো—বাবার ঐ স্বভাব। অল্পেই ঘাবড়ে যায়। একটু সাবধান থাকতে দোষ কি?

—না তা নয়।—বিব্রতভাবে বললেন সত্যবাবু : তবে শুনেছি নাকি 'ই.সি. জি' করাটা একটু ঝামেলার ব্যাপার?

ছোটমামা হাসলো—কেন? ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের প্রথমে 'ইলেকট্রো' আছে বলে কি সেটা শক্ মারবে?

—না, তা ঠিক না, ব্যাপারটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কিছু নেই তো, তাই বলছিলাম...

—ভয়ের কিছু নেই। জানলে আর ভয় থাকবে না। গাবলু—মানুষের হার্টরেট কতো?

চুইংগামের প্যাকেট খুলতে খুলতে নির্লিপ্তভাবে গাবলু বললো—দিনে লাখ বার।

—ঠিক বলেছিস। দিনে লাখবার অর্থাৎ মিনিটে সত্তর বাহাত্তর, এই ছন্দটা বজায় রাখছে কে?

টুম্পা বললো—এর উত্তরটা জানি মনে হচ্ছে। তুমি 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডের' কথা বলছো তো?

এসব চলবে না।—আপত্তি জানালেন সত্যবাবু : মামা ভাগ্নীতে এমন কোন কথা বলা উচিত নয় যেটা আমাদের কাছে 'ল্যাটিন' বলে মনে হয়!

কিছু 'ল্যাটিন' ব্যাপার না।—ছোটমামা বললো : হার্টটা যদি একটা চার কামরাওয়ালা বাড়ি হয়, তাহলে বাড়ির মেন সুইচ মানে 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড'টা বসানো আছে ওপর তলার ডানদিকের ঘরের পেছনের দেওয়ালে।

চুইংগামটা টেনে লম্বা করতে করতে গাবলু বললো—'মেনসুইচ' মানে ইলেকট্রিকের লাইন?

—একেবারে ঠিক বলেছিস্। ঐখান থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ তৈরী হচ্ছে, তারপর সেখান থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ সারা হার্টে ছড়িয়ে পড়ছে।

—যে ভাবে 'মেন' থেকে ঘরে ঘরে লাইন টানা হয় ?

—এখানে সিস্টেমটা একটু আলাদা। 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড' থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ তৈরী হলেও সেটা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব কিন্তু তার না।

—তাহলে সেটা ছড়াচ্ছে কে ?

—বলছি রে বাবা, বলছি। শান্ত পুকুরে ঢিল ফেললে ঢেউ উঠতে দেখেছিস তো ? এখানেও ব্যাপারটা তাই। 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড' থেকেও বিদ্যুৎতরঙ্গ সেইরকম ঢেউ-এর মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গকে 'রিলে' করার জন্যে আর একটা স্টেশন আছে যার নাম 'অ্যাট্রিও-ভেণ্ট্রিকিউলার' বা সংক্ষেপে 'এ. ভি. নোড'। এটাও ডান অলিন্দের দেওয়ালে থাকে, তবে 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডের' মতো ওপরদিকে নয়, বরং নিচের দিকেই—নিলয়ের কাছ বরাবর। এই 'এ. ভি. নোড' থেকেই ইলেকট্রিক লাইনের মতো সব নার্ভতন্ত্ত সারা নিলয়ে ছড়িয়ে গেছে।

টুম্পা বললো—জটিল ব্যাপার !

—তা একটু জটিল বৈ কি। ডাক্তারি বই-এ এদের, মানে ঐ সব নোড আর তাদের শাখা-প্রশাখাদের একসঙ্গে বলে 'জাংশনাল টিস্যু'। হার্টের বেশীর ভাগ গণ্ডগোলের সূত্রপাত কিন্তু ঐ 'জাংশনাল টিস্যু' থেকেই।

সত্যবাবু বললেন—কথায় কথায় কিন্তু তুমি আসল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছো।

ছোটমামা বললো—মোটেই না। এতক্ষণে বরং 'ই. সি. জি.' প্রসঙ্গে আসার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষুণি বললাম না—'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড' থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ 'এ. ভি.নোডের' মারফত সারা হার্টে ছড়িয়ে পড়ছে ? এখন, আমাদের শরীর হচ্ছে বিদ্যুতের সুপরিবাহী। সুতরাং হার্টের মধ্যে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরী হচ্ছে সেটা সারা শরীরেই ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের একটা আন্দাজ দিচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

গাবলু বললো—এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যন্ত্রটা কি করে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপছে ছোটমামা ?

প্রবলবেগে হাত নাড়লো ছোটমামা।—ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম নয়, ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ। যন্ত্রটার নাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ, তার থেকে যে রেকর্ড বা চার্ট আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম। আসলে ই. সি. জি.-তে আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপছি না, বরং যেটা দেখছি তা হলো বিদ্যুৎবিভব মানে 'পোটেনসিয়াল ডিফারেন্স'।

সত্যবাবু বললেন—এটাও তাহলে প্রায় ইলেকট্রিক্যাল লাইনের মতোই ? ঝপ্ করে আলোগুলোর জোর কমে গেলে যেমন আমরা ভোল্টেজ-ড্রপের কথা চিন্তা করি ?

—ঠিকই বলেছেন। হার্ট থেকে যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা তো আর শরীরের সব জায়গায় সমানভাবে পৌঁছোচ্ছে না? শরীরের দুটো বিন্দু থেকে যদি আমরা এই তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে একটা 'গ্যালভানোমিটারে' জুড়ে দিই তাহলে ঐ দুটো বিন্দুর মধ্যে একটা 'তড়িৎবিভব' পাবো তো? তবে হ্যাঁ— মাপাটা ভারী ঝামেলার কাজ, কারণ যে তড়িৎবিভবটা আমরা পাবো তার মাপটা হবে কয়েক মিলিভোল্ট মাত্র।

টুম্পা বললো—'গ্যালভানোমিটারে' তো সেটা ধরাই পড়বে না?

—সেজন্যেই এই ভোল্টেজকে যান্ত্রিক উপায়ে বাড়িয়ে নিয়ে রেকর্ড করা হয়। এটাকে টি· ভি.-র পর্দার মতো ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপ যন্ত্রে দেখা যেতে পারে কিংবা সরাসরি কাগজের ওপর কালি দিয়ে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম হিসেবে আঁকাও সম্ভব।

গাবলু বললো—দু-রকম ব্যবস্থা কেন?

—ধর, কোনো একটা অপারেশন চলছে। প্রতি মুহূর্তে রোগীর হার্টের অবস্থা জানা ডাক্তারদের প্রয়োজন। এই চটজলদি খবরের জন্য আছে ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপ। এই খবর কিন্তু ধরে রাখা যাবে না। ভবিষ্যতের জন্য এই খবরকে ধরে রাখতে হলে কালিতে আঁকা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামই ভরসা।

কিন্তু এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম থেকে ডাক্তাররা কি বোঝেন?—সত্যবাবুর জিজ্ঞাসা।

—আসলে এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ছবিটা গোটা হার্টের বৈদ্যুতিক কীর্তিকলাপের ছবি। ছবির বিশেষ একটা অংশ ডানদিককার অলিন্দের খবর জানায়, কোনটা বা বাঁ-দিকের নিলয়ের—এরকম আর কি। হার্টে যদি কোন গণ্ড-গোলের সূত্রপাত হয়, এই ই.সি.-জিই বলে দেবে গণ্ডগোলের উৎসটা কোথায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সত্যবাবু।—তাহলে মনে হচ্ছে ভয়ের কিছু নেই। সময় মতো একটা ই. সি. জি. করিয়ে নেবো। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলো দেখি, সুনীল ডাক্তার আমাকে ই. সি. জি. করাতে বলছে কেন?

রুমাল বার করে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ছোটমামা বললো– আপনার ব্লাড-প্রেসার একটু বেশী। তাছাড়া প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ দেখে বুঝছি মাঝে মধ্যে বুকে ব্যথার ব্যামোও আছে আপনার। বাড়তি প্রেসার থাকলে হার্টকে রক্ত ঠেলতে হয় বেশী জোরে, বাড়তি চাপে বাড়তি কাজ করতে হয় আর কি! অনেকদিন যাবৎ এরকমটা চলতে থাকলে হার্টের পেশীগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আর তা থেকে নানা গণ্ডগোলের সূত্রপাত। যেহেতু হার্টের পেশীগুলো মারফৎ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, হার্টের কোন অংশ গড়বড় করার মতো অবস্থায় এলেই তার আগাম খবর পাওয়া যাবে ই· সি· জি.-র ছবিটা দেখলেই।

হাই তুললেন সত্যবাবু।—দাবাতেও হারিয়েছো, লেকচারও শোনালে। এবার প্রেসারটা মেপে দাও দেখি?

সোফা-কাম-বেডে শুয়ে পড়লেন সত্যবাবু।



ঈশান কোণের চিলতে মেঘ !

বাবার এই এক বাতিক।—ঝাড়নটা টেবিলের ওপর রাখলো টুম্পা।

কোনটা ?—প্রেসার মাপার যন্ত্রটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলো ছোটমামা।

—প্রেসার মাপানো। তুমি কিংবা সুনীলকাকা কেউ এলেই হলো। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাবা বলবে, প্রেসারটা দেখে দাও তো ?

সত্যবাবুর হাতে পট্টি জড়াতে জড়াতে বললো ছোটমামা—না। এই বাতিকটা ভাল। এমনিতেই রক্তচাপ একটু বেশীর দিকে, তাই মাঝে মাঝে 'চেক-আপ' করানো ভাল।

—একটা কথা বলো দেখি, এই প্রেসার মেপে তোমরা কি বোঝো ?—শুয়ে শুয়েই প্রশ্নটা রাখলেন সত্যবাবু।

—রক্তচাপ মাপার গুরুত্ব নেই ? প্রেসার না থাকলে রক্তনালীর ভেতর রক্ত চলাচল করতো কি করে ? শুধু তাই নয়, এই ধাক্কার চোটেই 'ক্যাপিলারী-বেডে' ফিলট্রেশন হচ্ছে, অর্থাৎ রক্ত থেকে হজম হওয়া খাবারের কণা কিংবা জল, যাই বলুন না, সেগুলো বিভিন্ন কোষে পেঁছোচ্ছে কিংবা কিডনি দিয়ে যাবার সময় ব্লাড-প্রেসারের দরুনই রক্ত থেকে জল আলাদা হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্লাড-প্রেসারের গতিপ্রকৃতি জানলে হার্টের অবস্থারও একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া সম্ভব।

সত্যবাবু বললেন—হুঁ। আজকের প্রেসার কত ?

টেবিলের ওপর থেকে প্যাডটা টেনে নিয়ে ছোটমামা লিখে ফেললো—১৬০/১০০।

—দুটো সংখ্যা কেন ?

'সিস্টোল' আর 'ডায়াস্টোল'। ঠিক বললাম তো ছোটমামা ?—নড়েচড়ে বসে টুম্পা।

—ঐ ব্যাপারটাই আমার গুলিয়ে যায়। কোনটা যে কি, কিছুতেই ঠিক করতে পারি না আমি।—হতাশভাবে বললেন সত্যবাবু।

—আসল কথা হলো, রক্ত কত জোরে রক্তনালীর ভেতরের গায়ে ধাক্কা মারছে। সেটাই হলো ব্লাড-প্রেসার। এখন টুম্পা বল্ দেখি, রক্তনালীর গায়ে সব থেকে জোরে ধাক্কা লাগবে কখন ?

—যখন হার্টটা সব থেকে জোরে পাম্প করছে। এটাই হলো সিস্টোলিক প্রেসার।

—এবার গাবলু বল্ তো, রক্তনালীর গায়ে সব থেকে কম জোরে ধাক্কা লাগছে কখন ?

—হার্টটা যখন প্রসারিত হচ্ছে ?

ভেরী গুড !—নড়েচড়ে বসলো ছোটমামা ঃ তাহলে বুঝতেই পারছেন রক্তবহা নালীর গায়ে সব থেকে জোরে ধাক্কা পড়ছে যখন, সেটাই হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেসার। আর হার্ট যখন ডায়াস্টোলে থাকছে মানে প্রসারিত হচ্ছে, তখনকার প্রেসারটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক প্রেসার। সিস্টোলিক প্রেসার সবসময় ডায়াস্টোলিকের চেয়ে বেশী, তাই সিস্টোলিক লেখা হয় ওপরে, তলায় ডায়াস্টোলিক।

অর্থাৎ তুমি বলছ আমার সিস্টোলিক প্রেসার ১৬০ আর ডায়াস্টোলিক ১০০। এটাকে কি হাই প্রেসার বলবো ?—উঠে বসলেন সত্যবাবু।

ছোটমামা বললো—এ তো আর দাঁড়িপাল্লার হিসেব নয় যে বলবো ১৪০ হলেই নর্মাল! আসলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেসারও বাড়তে থাকে। মোটামুটি একটা হিসেব হচ্ছে যে আপনার যা বয়স তার সঙ্গে ১০০ যোগ করলে তা হবে সিস্টোলিক প্রেসারের কাছাকাছি, আর ডায়াস্টোলিক যা হওয়া উচিত ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যাবে বয়সের সঙ্গে ৪০ যোগ করলে।

—তাহলে আমার ডায়াস্টোলিক প্রেসারটা একটু বেশী মনে হচ্ছে যে ?

—খুব একটা বেশী না, সামান্য বেশী। সেই জন্যেই তো বললাম প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধগুলো খেয়ে যান, সময়মতো একটা ই. সি. জি.-ও করিয়ে রাখুন। অবশ্য সিস্টোলিক প্রেসার বেশী থাকলে অতো কড়াকড়ির দরকার ছিল না।

গাবলু-টুম্পা দু'জনেই জিজ্ঞাসা করে উঠল—তুমি ডায়াস্টোলিক প্রেসারকে এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন ?

প্রেসার মাপার যন্ত্রটা বন্ধ করতে করতে ছোটমামা বলল—আসলে একটু উত্তেজনা, ভয় কিংবা নেহাতই ভরপেট খেলেও সিস্টোলিক প্রেসার খানিকটা বাড়ে। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। খানিক পরেই ওটা নর্মাল হয়ে যাবে। আসলে এটা আমাদের জানাচ্ছে যে হার্টটা কত জোরে রক্ত পাম্প করছে, কিংবা বলতে পারিস হার্ট কতটা কাজ করছে।

—আর ডায়াস্টোলিক প্রেসার ?

—ওটি কিন্তু অত সহজে ওঠানামা করে না। আসলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার 'পেরিফেরাল রেজিসট্যান্সের' সূচক, অর্থাৎ কতটা বাধা অতিক্রম করে রক্তকে এগুতে হচ্ছে। কিংবা বলতে পারিস কতটা বাধার বিরুদ্ধে হার্টকে কাজ করতে হচ্ছে।

ব্যাপারটা কেমন যেন জটিল বলে মনে হচ্ছে ?—ভ্রূ কোঁচকালেন সত্যবাবু।

—কিছুই না। একটা উদাহরণ দিই, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরুন আপনি মনের সুখে তেল, ঘি, মাছ, মাংস খেয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে রক্তবহা নালীগুলোর ভেতরের গায়ে 'কোলেস্টেরল' জমতে থাকবে। আগে এই রক্তবাহী নালীগুলো ছিল ইলাষ্টিকের মতো, অর্থাৎ রক্তের চাপ বাড়লেই দেওয়ালটা পাশে সরে যেত, রক্তও তার নিজের রাস্তায় স্বচ্ছন্দে বয়ে যেত। এখন দেওয়ালগুলো পুরু হওয়ায় তারা বেশী সরতে পারবে না, ফলে রক্তকেও বেশী চাপ দিয়ে নিজের পথে চলতে হবে। অনেকটা সেই ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে চলারমতো। এতে হার্টের পরিশ্রম হচ্ছে বেশী। সুতরাং ডায়াস্টোলিক প্রেসার বাড়লে বোঝা যাচ্ছে যে বেশী-বাধার মধ্যে দিয়ে হার্টকে কাজ করতে হচ্ছে, অর্থাৎ হার্টের ঘাড়ে একনাগাড়ে বাড়তি কাজের বোঝা থাকছে।

টুম্পা বললো—তাহলে সিস্টোলিক প্রেসার ১০ বা ১৫ বাড়ার চাইতে ডায়াস্টোলিক প্রেসার ৫ বাড়া অনেক বেশী বিপজ্জনক, কি বল ?

—নিশ্চয়। সেই জন্যেই দেখবি ডাক্তারবাবুরা অনেক সময় দু'বার প্রেসারটা দেখে নেন, বিশেষত যদি দেখেন ডায়াস্টোলিক প্রেসারটা বেশী।

আচ্ছা ঐ রবারের বেলুন টিপে আর হাতে স্টেথিসকোপ বসিয়ে প্রেসারটা বুঝতে পারো কি করে ?—পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করে গাবলু।

—এইভাবে রক্তচাপ মাপাকে বলে 'ইনডিরেক্ট অসকালটেটরী মেথড'।—চশমার ফাঁক দিয়ে গাবলুর দিকে তাকালো ছোটমামা।

যথেষ্ট খটমটে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে ?—টুম্পার জিজ্ঞাসা।

—কিছুই না। সরাসরি রক্তনালীর মধ্যে একটা ফাঁপা সুঁচ ঢুকিয়ে তার সঙ্গে যদি একটা ম্যানোমিটার জুড়ে রক্তচাপ মাপা যেত, তাহলে সেটা হতো 'ডিরেক্ট' মানে সরাসরি পদ্ধতি। কিন্তু এখানে সেটি হচ্ছে না। এখানে বিশেষ একটা রক্তনালীর 'অসকালটেশন' মানে নড়াচড়া দেখে পরোক্ষভাবে আমরা প্রেসারটা মেপে ফেলছি।

তবুও ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে ছোটমামা।—যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বলল গাবলু।

—খটমট্ কিছুই না, শুধুমাত্র ঐ নামটা ছাড়া। এই যে যন্ত্রটা দেখছিস্, এর নাম হল স্ফিগমোম্যানোমিটার। ওপরের ডালাটার সঙ্গে দেখ্ একটা স্কেল

লাগানো আছে। পাশে একটা 'মার্কারী কলাম্' মানে টিউবের মধ্যে পারদ আছে।

টুম্পা বললো—অনেকটা আমাদের স্কুলের 'ব্যারোমিটার' যন্ত্রটার মতো।

—আরে বাবা, এটাও অনেকটা সেই ধরনের জিনিস, তবে মিনি-সাইজের। পাশের স্কেল থেকে বোঝা যাবে পারদ কতটা উঠছে বা নামছে।

—কিন্তু যন্ত্রটা প্রেসার মাপছে কি করে?

—হাতের যে রক্তনালীটার ওপর স্টেথিস্কোপ বসালাম, তার নাম হচ্ছে 'ব্রেকিয়াল-ধমনী'। প্রথমটায় কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না, কারণ রক্ত তখন কোনোরকম বাধা না পেয়েই ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেই পাম্প করে হাতে বাঁধা ব্যাগটার মধ্যে বাতাস পুরে দেওয়া হল, তার চাপ পড়ল ধমনীর ওপর। ফলে রক্ত চলাচলও গেল বন্ধ হয়ে।

—মানে তুমি বলছো যেন একটা রবারের নলের মধ্যে দিয়ে রক্তটা যাচ্ছিল, নলটা চেপে ধরতেই রক্ত চলার রাস্তাটা আটকে গেল।

—ঠিক বলেছিস। এরপর আস্তে আস্তে বাতাসের চাপ কমাতে হবে। তখন রক্তবাহী ধমনীর ওপর চাপও আলগা হবে, ফলে একটুখানি রাস্তা দিয়ে অনেকটা রক্ত হুড়মুড় করে যাবার চেষ্টা করতে শুরু করবে। ঐ আওয়াজটাই প্রথমে স্টেথো'তে শোনা যায়। এখানে প্রেসার মাপার মূল নীতি হলো যে আমরা ধমনীর রক্তচাপের সঙ্গে ব্যাগের বাতাসের চাপকে 'ব্যালান্স' মানে সমান করার চেষ্টা করছি এবং বাতাসের চাপ কতো হচ্ছে সেটা ঐ ম্যানোমিটার দেখে বুঝতে পারছি।

টুম্পা বললো—তাহলে যখনই রক্ত হুড়োহুড়ি করে চলতে শুরু করলো তখন সেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি 'সিস্টোলিক প্রেসার'?

—ঠিক বলেছিস্। ক্রমে চাপ যত কমবে, রক্ত যাবার জন্যে জায়গাও পাবে বেশী। তখন স্টেথো'তে আওয়াজ কমতে কমতে শেষে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাবে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি চলার থেকে গতিটা একদম স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেটাই আমরা ধরবো 'ডায়াষ্টোলিক প্রেসার'।

—বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো? টুম্পা বলল—আচ্ছা ছোটমামা, এভাবে প্রেসার মাপার বুদ্ধি কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল বল তো?

মাথা চুলকাল ছোটমামা।—যতদূর মনে পড়ছে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, খুব সম্ভবত ১৯০৫ সালে কোরাটকোফ নামে এক রুশ বিজ্ঞানী এটা মাথা খাটিয়ে বার করেছিলেন। অবশ্য এতে যে প্রেসার আমরা মাপছি, সেটা একেবারে সঠিক হয় না, সামান্য কিছু ভুল থেকেই যায়। শোনার ব্যাপার তো? সকলে একরকম না'ও শুনতে পারে?

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন সত্যবাবু। এবারে মুখ খুললেন—কি রকম?

—আমরা যখন কলেজে পড়তাম, একটা মজার পরীক্ষা দেখেছিলাম। দেখেছিলাম—মানে করেছিলাম। আমাদের পরিচিত এক দাদা, সেই সময় গবেষণা করতেন। একদিন আমাদের ক'জন বন্ধুকে ডেকে বললেন—দেখ, আমরা এক একজন কানে এক একরকম শুনি।

আমরা বললাম, দূর। তা হয় নাকি?

দাদা বললেন, বেশ—তোদের মধ্যে একজন 'গিনিপিগ' হয়ে যা, মানে অন্য ক'জন একে একে ওর ব্লাডপ্রেসার মেপে ফেল।

আমরাও তাই করলাম, দেখলাম এক একজন এক একরকম মেপেছি। যদিও 'রিডিং' সকলেরই কাছাকাছি হয়েছে, তবুও খানিকটা পার্থক্য থাকছেই। আসলে দাদা সেই সময় গবেষণা করছিলেন একই সময়ে একই পরিবেশে আমাদের শোনার পার্থক্য কেন হচ্ছে সেই নিয়ে! যাক্‌গে, সে কথা!

সেইজন্যেই তুমি বলছো স্ফিগমোম্যানোমিটারে একদম নিখুঁত প্রেসার মাপা যায় না?—সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লো টুম্পা।

—অবশ্য চেম্বারে বসে রোগী দেখার সময় দু-পাঁচ মিলিমিটারের তফাৎ হলে কিছু আসে যায় না। টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাসটা টেনে নিল ছোটমামা : সিস্টোলিক প্রেসার যদি ১৯০ না হয়ে ১৯৫ হত তাহলেও একই ওষুধে কাজ হতো। আসলে প্রেসার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নি আর কি!

টুম্পা বললো—মোটামুটিভাবে জানলেই যখন কাজ হয়ে যায়, তখন একেবারে সঠিক প্রেসার জানার দরকারটাই বা কি?

—আসলে এ নিয়ে ডাক্তারদের বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের। তাদের তো আর সব সময় মোটামুটি আন্দাজে কাজ চলে না?

সত্যবাবু বললেন—ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো?

ধরুন, এমন একটা নতুন ওষুধ তৈরী হচ্ছে যেটা রক্তচাপের মাত্রা বাড়াবে কিংবা কমাবে। এখন এই ওষুধটা কি মাত্রায় দিলে কতটা ব্লাড প্রেসারের পরিবর্তন হবে সেগুলো চুলচেরা বিচার না করলে ওষুধটা দোকানে আসতেই পারবে না। কিংবা ধরুন, কারুর হার্টে বড় ধরনের কোন 'অপারেশন' হচ্ছে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে রক্তচাপের খবর রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।—জলের গেলাসটা নামিয়ে রাখলো ছোটমামা।

তাহলেই দেখো,—টুম্পা বললো : নিখুঁতভাবে কিংবা প্রতি মুহূর্তে প্রেসার মাপা, কোনটাই এই স্ফিগমোম্যানোমিটারের কর্ম নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারগুলো সম্ভব তো হচ্ছে?—মুচকি হাসলো ছোটমামা।

—যন্ত্রটা কি ছোটমামা?

—এগুলো হচ্ছে, এগুলোই বলবো, এর নানা মডেল আছে, দরকার বুঝে এক এক জায়গায় ব্যবহার হয়। এদের নাম হচ্ছে 'প্রেসার ট্রান্সডিউসার'।

সত্যবাবু এতক্ষণ চোখ বুজে কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। বললেন—'ট্রান্সডিউসার' তো ইঞ্জিনিয়ার আর পদার্থবিজ্ঞানীদের সম্পত্তি বলেই জানতাম! ডাক্তাররাও ঐদিকে হাত বাড়িয়েছে?

ছোটমামা হাসল।—সত্যি! ইঞ্জিনিয়াররা কোথায় নেই? এখন তো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ! ইঞ্জিনিয়াররা যন্ত্রপাতি বানাচ্ছেন, আর বিজ্ঞানীরা ভাবছেন সেইগুলো কিভাবে ডাক্তারীর কাজে লাগানো যায়। কত সুবিধে হচ্ছে বলুন তো?

কিন্তু এই ট্রান্সডিউসার কি করে কাজ করছে সেটা বললে না তো?—জিজ্ঞাসা করে টুম্পা।

—ধর্, একটা রক্তবহা ধমনীতে একটা সূঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, সূঁচের পেছনে থাকছে একটা তরল পদার্থ ভর্তি সিরিঞ্জ। তোরা ফিজিক্সের বইতে প্যাসকালের সূত্র পড়েছিস্ তো?

কিন্তু তার সঙ্গে ট্রান্সডিউসারের কি সম্পর্ক?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে টুম্পা।

সত্যবাবু বললেন—ব্যাপারটা সোজা বলেই মনে হচ্ছে। প্যাসকালের সূত্র অনুসারে রক্তের চাপ সিরিঞ্জের ভেতরের তরলে সঞ্চারিত হবে। তাই তো?

—অবশ্যই। এই চাপ এখন তরলের মধ্যে চারিদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে যাবে। এবার ধরা যাক, সিরিঞ্জে 'পিষ্টনের' বদলে একটা পাতলা পর্দা আছে। তাহলে কি হবে?

একটু ভেবে নিয়ে টুম্পা জিজ্ঞাসা করল—পর্দাটা তরলের চাপে কাঁপতে পারে কি?

আলমোড়া ভাঙলো ছোটমামা।—কাঁপবেই। এবং এই কম্পনের শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করে একটা রেকর্ডারে পাঠাতে পারলেই কেল্লা ফতে।

সত্যবাবু বললেন—আসলে এই শক্তি রূপান্তরের কাজটাই করছে ট্রান্সডিউসার। তাই তো?

গাবলু বললো—আচ্ছা ছোটমামা, তুমি যে বললে নানারকম ট্রান্সডিউসার আছে? প্রত্যেকেই কি একই কাজ করছে?

—কাজটা এক করলেও করার পদ্ধতিগুলো একটু আলাদা আলাদা। যেমন

ধরু, পাতলা পর্দার বদলে ছোট্ট মাপের পাতলা তারের 'স্ট্রেন গেজ' থাকতে পারে, কিংবা একটা 'কনডেনসার' থাকতে পারে কিংবা আরো অন্য ধরনের জিনিস। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকেই এই চাপের পরিবর্তনকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করছে।

টুম্পা বললো—কিন্তু ছোটমামা, এই যে রক্তের চাপ, এর থেকে কতই বা বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে?

ছোটমামা ঘাড় নেড়ে বললো—ইঞ্জিনিয়ারদের বাহাদুরী তো সেইখানেই। এই যে স্ট্রেন-গেজ, ক্যাপাসিটার বা ইনডাকটেনস্ ট্রান্সডিউসার, এদের বিশেষত্বই হলো খুব সামান্য চাপের তারতম্যও এরা ধরতে পারে। অবশ্য বিদ্যুৎশক্তি, মানে বিভব-প্রভেদের মানটা হবে মিলি বা মাইক্রোভোল্টে, মানে এক ভোল্টেরও কয়েক হাজার ভাগ মাত্র।

টুম্পা বললো—এটা মাপা তো কঠিন?

—ছোট্ট জিনিসকে বড় করে দেখার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে তো? তেমনি ভোল্টেজকে বড় করে দেখতে হলে যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগে তার নাম 'অ্যামপ্লিফায়ার'। এই 'অ্যামপ্লিফায়ারের' মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে যে ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে তাকে 'গ্যালভানোমিটার' দিয়ে মেপে ফেলা যেতেই পারে। তারপরে সেটা ইচ্ছামতো পেন-রেকর্ডারে কাগজের ওপর লিখেও ফেলা যায় কিংবা টি-ভি পর্দার মতো 'ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপে' চোখেও দেখা যেতে পারে।

গাবলু-টুম্পা একসঙ্গে বললো—কানে না শুনে স্রেফ চোখ দিয়েই প্রেসার মাপা যাচ্ছে? বেশ মজা তো?

সত্যবাবু বললেন—সবই তো শুনলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে?

—কি ব্যাপার?

—আমার কথা হলো, সাধারণ মানুষ তো আর নিয়মিতভাবে প্রেসার মাপায় না, তাছাড়া সব সময় ঠিক মতো সুযোগ-সুবিধেও তো হয়ে ওঠে না। এমন কোনো লক্ষণ আছে কি, যা দেখা দিলে বুঝতে হবে রক্তচাপের পারদ এবার ঊর্ধ্বমুখী?

মাথা ঝাঁকাল ছোটমামা।—অবশ্যই। হঠাৎ করে অকারণে মাথা ঘুরে যাওয়া, কিংবা ঘুম থেকে উঠে মাটিতে পা রাখতেই মনে হলো মাটিটা দুলে উঠলো, এমনি হলে বুঝতে হবে প্রেসার হয়তো বেড়েছে।

সত্যবাবু বললেন—আমার তো প্রায় এমন হয় যে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছি, হঠাৎ যেন চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল পাঁচ দশ সেকেণ্ডের জন্যে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা ধরে সামলে নিতে হয়।

—এটাও কিন্তু প্রেসার বাড়ার লক্ষণ! সুতরাং চলাফেরার ব্যাপারে আর একটু সাবধান হওয়া ভালো।

গাবলু বললো—আমাদের অংকের স্যার সব সময় খিট্‌খিট্‌ করেন। ভূগোল স্যার সেদিন বলছিলেন অংক-স্যারের নাকি প্রেসার বেড়েছে।

মুচকি হাসলো টুম্পা—এ লক্ষণটা বাবার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, বুঝলে ছোটমামা!

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো ছোটমামা।—দোষটা কিন্তু তোদের বাবার নয়। দিনের মধ্যে বিশবার তুই, গাবলু আর তোদের মা এই তিনজনে তোর বাবাকে এটা চাই, ওটা এনো, এসব বলে সমানে বিরক্ত করছিস। বিরক্ত হলে বা রেগে গেলে প্রেসার তো বাড়বেই।

—দরজার দিকে পা বাড়ালো ছোটমামা।



চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাম !

সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে।

খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে উল্টোতে সত্যবাবু বললেন—এখন শুধু এই এক খবর। ব্যাংক ডাকাতি, লাখ লাখ টাকা লুঠ, খুন, জখম, লোকজন বাড়ি ঢুকে ভয় দেখিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে, পুরোপুরি অরাজক অবস্থা। সব সময় দুশ্চিন্তা। ঘরে বাইরে কোথাও এখন মানুষের শান্তি নেই।

যা বলেছেন। এখন তো যতো রোগী দেখছি, তাদের অর্ধেকেরই দেখি রোগের মূল কারণই হচ্ছে ভয়, ভাবনা আর দুশ্চিন্তা।—ছোটমামা কখন যে ঘরে ঢুকেছে, খেয়ালই করেনি কেউ।

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসতে বসতে ছোটমামা বললো—দুশ্চিন্তা থেকে যত রকম রোগ হচ্ছে, তাদের লিস্টি বানালে দেখা যাবে তাতে কি নেই? অম্বল, গ্যাসট্রিক ব্যথা, হাইপ্রেসার এমন কি হার্টের রোগের উপসর্গ পর্যন্ত।

—বল কি? দুশ্চিন্তা থেকে হার্টের রোগ?

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো ছোটমামা।

—ডাক্তারীতে এই রোগের নাম 'কার্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিস'।

কিন্তু দুশ্চিন্তার সঙ্গে হার্টের সম্পর্কটা কোথায়?—চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে বসলেন সত্যবাবু।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ছোটমামা বললো—মানুষের মনের গতি বড় বিচিত্র। দুশ্চিন্তা, ভয় বা বিরক্তি, এগুলো সবই আমাদের ব্রেনের হায়ার সেন্টারগুলোকে উত্যক্ত করছে। একটু ভেবে দেখুন, হঠাৎ করে রেগে গেলে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলো সাময়িকভাবে এলোমেলো হয়ে যায় কি না?

গাবলু বললো—সে আর বাবাকে তুমি কি বোঝাবে? কোন কারণে রেগে গেল কি, ব্যাস্! স্নান খাওয়া কিছু না করে সোজা অফিসে চলে যাবে।

টুম্পা বললো—তাছাড়া রেগে গেলে মুখচোখ লাল হয়ে যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার দ্রুত হওয়া....

ছোটমামা বললো—হ্যাঁ। কিন্তু যদি একটা বড় ধরনের সমস্যা হঠাৎ করে সামনে এসে হাজির হয়, তার ফলে আমাদের মাথার কাজকর্ম, মানে স্বাভাবিক চিন্তাগুলো একেবারে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। এটাই হচ্ছে 'নিউরোসিস'। এটাও বোধ হয় জানিস, হার্টের কাজকর্মের ওপর 'ব্রেন' খবরদারি চালায় নার্ভের মারফৎ? 'হেড-অফিসে' যদি কাজকর্ম ঠিকঠাক না চলে, তার ফলে হার্টও কাজ করবে এলোমেলো ভাবে। অর্থাৎ 'নিউরোসিসের' ফলে রক্ত-চলাচল এবং হার্টের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হচ্ছে। একেই আমরা বলছি 'কার্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিস'।

আড়মোড়া ভেঙ্গে সত্যবাবু বললেন—আমার এখানে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি যেমন বললে হঠাৎ মানসিক চাপ হার্টের গণ্ডগোলের কারণ হতে পারে, তেমনি রোজকার জীবনে ছোটখাট অসন্তোষ জমা হতে হতেও তো এ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে?

ছোটমামা হাসলো।—আসলে অধিকাংশ হার্টের অসুখ নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, আপনার অনুমানই ঠিক। বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি কিংবা অফিসে সহকর্মী কিংবা ওপরওয়ালাদের খারাপ ব্যবহার, এরই প্রতিফলন আমরা দেখি মেজাজের খিটখিটানি আর তার সূত্র ধরে আসে হাই ব্লাড-প্রেসার; তার পরোক্ষ ফল হচ্ছে হার্টের গণ্ডগোলের উপসর্গ। গাবলু, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, এক গ্লাস জল খাওয়া।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা ছোটমামা, তুমি যে বললে হঠাৎ মানসিক আঘাতের ফলে হার্টের নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে, সেরকম কোন ঘটনা তুমি দেখেছো?

ছোটমামা বললো—এই তো সেদিনই এক 'পেশেন্ট' দেখলাম। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, আগেই প্রেসার একটু বেশী ছিল। ট্রেনে যাবার সময় যে কামরায় ভদ্রলোক ছিলেন, সেই কামরায় ডাকাতি হয়, ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ কিছু টাকা-কড়ি ছিল, সব চলে যায়। এই মানসিক আঘাতের ফলে ভদ্রলোকের প্রেসার আরও বেড়ে গেল, হার্টের ধুকপুকুনির ছন্দটাও গেল পাল্টে। ভদ্রলোক ভয়ের চোটে বাড়ি থেকে বেরোনই বন্ধ করে দিলেন। ভদ্রলোককে ওষুধপত্রের সঙ্গে দেওয়া হল প্রচুর ঘুমের ব্যবস্থা। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেল দুশ্চিন্তা কমেছে, তার সঙ্গে হার্টের চলার ছন্দও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

টুম্পা বললো—সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার!

একচুমুকে জলের গ্লাস নিঃশেষ করলো ছোটমামা।

—তোর বাবা যে কথা বলছিল, সেরকম একটা ঘটনার কথা বলি। এক ভদ্রলোক এলেন, তাঁর হৃদস্পন্দনের হার খুব দ্রুত, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, শোয়ার

সময় বুকের বাঁ দিকে ব্যথা। কোন বন্ধুর পরামর্শে রক্তের কোলেস্টেরল, ই. সি. জি. সব করিয়ে দেখাতে এসেছেন। ভাল করে কথাবার্তা বলে জানা গেল অফিসের 'বস' তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েক মাস খারাপ ব্যবহার করছেন ; 'প্রাইভেট' অফিস, প্রায়ই হুমকি দেওয়া হয়—চাকরি আর থাকবে না। ভদ্রলোকের বরাত ভাল, যোগাযোগের ফলে অন্য অফিসে কাজ পেয়ে গেলেন, রোগও সেরে গেল।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক কারণে এই অসুখ হতে পারে, কি বলো?

ছোটমামা মাথা নেড়ে বললো—অজস্র কারণ থাকতে পারে। যেমন ধরুন, অনেস বয়স্কা মহিলা আসেন ডাক্তারদের কাছে, যাঁদের বক্তব্য, তাঁরা সামান্য কারণেই ভয় পেয়ে যান, শরীরের মধ্যে আনচান করতে থাকে, ঘাম হয়, মনে হয় এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। এটা নিশ্চয় হার্টের গন্ডগোলের সূত্রপাত ! আসলে ব্যাপারটা কিছুই না, বয়স হয়ে গেলে মহিলাদের শরীরে কতকগুলো 'হরমোন' কমে যায় ; সে সময় তাঁরা মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকেন। এসব লক্ষণ তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

টুম্পা এতক্ষণ ছোটমামার কথা শুনছিল। হঠাৎ ও প্রশ্ন করে বসলো—তাহলে যে রোগী হার্টের অসুবিধের কথা বলছে, তার সত্যি সত্যি হার্টের অসুখ বা সেটা মানসিক কারণে হচ্ছে, সেটা বুঝবে কি করে ?

ছোটমামা হাসলো।—এটা ডাক্তার না হলে বোঝা শক্ত। 'কার্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিসে' যাই লক্ষণ দেখা যাক না কেন, রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার হার্ট বেশ সুস্থ-সবলই আছে। তখন রোগীকে এমন ব্যবস্থা দিতে হবে যাতে সে ভালভাবে ঘুমোয়, চিন্তা কম করে, মনের আনন্দে থাকে। 'হেড-অফিস' ঠিকমতো কাজ করতে শুরু করলেই হার্টের ব্যামো দূরে পালাবে।

তোমার কথা শুনে তো রীতিমতো ভয় ঢুকে যাচ্ছে মনে।—নড়েচড়ে বসলেন সত্যবাবু ঃ অফিস-কাছারি না করেও উপায় নেই আবার সেখানেও অশান্তি এড়ানো শক্ত। 'কার্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিসের' হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল দেখছি।

—এ নিয়ে এত চিন্তার কি আছে ? পারতপক্ষে, মেজাজ গরম করবেন না অথবা অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না, দেখবেন 'কার্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিস' আপনার আশেপাশে ঘেঁসবে না। ব্লাড প্রেসার নিয়েও অযথা বেশী চিন্তা করবেন না। যাঁরা সব সময় চিন্তা করছেন 'এই বুঝি আমার প্রেসার বেড়ে গেল'—তাঁদের এই উদ্বেগই কিন্তু রক্তচাপ বাড়ানোর কারণ হিসেবে যথেষ্ট ! অবশ্য আপনার মতো 'পেশেন্ট' নিয়ে ডাক্তাররা বেশী মাথা ঘামান না, আসল

চিন্তা ভাবনা তাদের নিয়েই যাঁরা প্রেসার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান না, অথচ ভেতরে ভেতরে তাঁদের প্রেসার বেশ খানিকটা বেড়ে বসে থাকে।

সত্যবাবু বললেন—সেদিনের কাগজে দেখছিলাম খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ষাট হাজারের ওপর মানুষ প্রতি বছর এই ব্লাড প্রেসারজনিত অসুখে ভুগে মারা যান, উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন আড়াই কোটিরও বেশী মানুষ।

আসলে পশ্চিমী দেশগুলোতেই এই অসুখ বেশী—নির্লিপ্তভাবে বললো ছোটমামা ঃ বলতে পারেন উচ্চ রক্তচাপ বড়লোকদের অসুখ।

সত্যবাবু বললেন—এটা একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না? অসুখ আবার ধনী-গরীব বাছবিচার করে নাকি?

—অনেক অসুখ বাছবিচার না করলেও ব্লাড-প্রেসার করে। যাদের পয়সা বেশী, ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে বেশী, তাদের রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে চটপট্ এবং তার থেকেই হাই প্রেসারের সূত্রপাত। কিছুদিন আগে মার্কিন মুলুকে এক সমীক্ষা করা হয়েছিল, কোন পেশায় নিযুক্ত লোকজন উচ্চ-রক্তচাপে ভোগেন বেশী।

টুম্পা বললো—কারা বেশী ভোগে?

—দেখা গেছে যাঁদের কাজ মূলতঃ মাথা খাটানো, কিন্তু শারীরিক নড়াচড়া তত বেশী নয়, যেমন উকিল, ডাক্তার বা বড় বড় কোম্পানীর এক্জিকিউটিভ্ অফিসার—তাঁদের মধ্যে হাই প্রেসারের প্রবণতা বেশী। তার ওপর তাঁরা যদি বেশী মোটা হন বা বেশী পরিমাণে ধূমপান করেন, তাহলে ঐ প্রবণতা আরো বাড়বে। এর ওপর যদি বংশের ধারায় হাই প্রেসার থাকে, তাহলে প্রায় অবধারিতভাবে বলা যায় এক্ষেত্রেও হাই প্রেসার দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রবল।

সত্যবাবু বললেন—বুঝলাম।

লেকচারী ঢঙে হাত নাড়ল ছোটমামা।

—ব্লাড প্রেসার বাড়লে হার্টের কাজ বাড়ে, ফলে হার্টের মাসল্ কমজোরী হয়ে পড়ে এবং তার ফলে কি হতে পারে, সেদিন দাবার ছকে বসে বলেছিলাম, খেয়াল আছে তো?

ঘাড় নাড়লেন সত্যবাবু।

—অবশ্য 'হার্ট-ফেলিওর' পর্যন্ত গড়ানোর আগেই অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় 'থ্রম্বোসিস্' বা 'স্ট্রোকে' রোগী ইহলোকের মায়া কাটায়!

সত্যবাবু বললেন—হার্টফেল, স্ট্রোক, থ্রম্বোসিস, এগুলো তো সব একই ব্যাপার?

—তা কেন হবে? প্রত্যেকটা আলাদা অসুখ। রক্তচাপের বাড়তি চাপে

যদি রক্তনালী ছিঁড়ে যায়, সেটাকে বলবো 'ইনটারন্যাল হেমোরেজ'। যে সব রক্তনালী 'ব্রেনে' রক্ত পেঁাছে দিচ্ছে, তা ছিঁড়ে গেলে সাধারণভাবে বলা হয় 'স্ট্রোক'। আবার হার্টের পেশীগুলোতে যে রাস্তা ধরে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে, সেই রাস্তায় গণ্ডগোল হলে তার নাম 'হার্ট-ব্লক'।

আর হার্টফেল মানে হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া ?—গভীর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে টুম্পা।

—দূর। তা কেন হবে ? সাধারণভাবে বলা যায়, বেশী কাজ করে যদি হার্টের পেশী বড় হয় গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাকে বলা যায় হার্ট ফেলিওর। আবার যদি হার্টের কোন ভালভ্ বা এক কুঠুরী থেকে অন্য কুঠুরীতে যাবার রাস্তায় কোথাও যদি গণ্ডগোল হয়, তাহলে তাকেও আমরা 'হার্ট-ফেলিওর' বলতে পারি। 'ফেলিওর'—অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট অংশ, তার যা নির্দিষ্ট কাজ, তা সে করছে না। আমাদের দেশে অধিকাংশ 'ফেলিওরের' পেছনে দেখা যায় অন্য রোগের সূত্র ধরে হার্টের বিশেষ কোন অংশ খারাপ হয়েছে।

সত্যবাবু বললেন—একটু বিশদভাবে বলো দেখি ?

একটু কেশে ছোটমামা বললো—বেশী ভয় টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া আর 'রিউম্যাটিক ফিভার' মানে গেঁটে বাতকে। এই সব রোগের জীবাণুরা শরীরে বাসা বাঁধার পর রক্তস্রোতে মিশে ঘুরে বেড়ায় সারা শরীরে। যুতসই জায়গা পেলে জাঁকিয়ে বসতে কে না চায় ? এই রকম একটা পছন্দসই জায়গা হলো হার্ট।

ভ্রূ কুঁচকে টুম্পা শুধোলো—কিছু উপসর্গ নিশ্চয় আছে যা দেখে বোঝা যাবে হার্টে কোন জীবাণু বাসা বেঁধেছে কি না ?

সাধারণতঃ অল্প জ্বর সমানে চলছে, কিংবা টনসিলে বারবার ব্যথা হচ্ছে, ওষুধ খেলেও জ্বর একদম নামছে না, এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটে ব্যথা সরে যাচ্ছে, সেইসব ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে। অবশ্য হার্টের অসুখ বা হাই ব্লাড প্রেসার কখন কিসের সূত্র ধরে আসে, বলা মুস্কিল।—আলমোড়া ভাঙ্গলো ছোটমামা।

সত্যবাবু বললেন—কেন ?

—এই যেমন ধরুন, কারুর কিডনির গণ্ডগোল আছে, ঠিকমতো প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। এখানে এই গণ্ডগোলের সূত্র ধরে ব্লাড প্রেসার চড়তে পারে। আবার ধরুন 'থায়রয়েড' বা 'অ্যাডরেনাল' গ্রন্থির থেকে বেরিয়ে আসা কিছু হরমোনের পরিমাণ কমা বা বাড়ার সঙ্গে ব্লাড প্রেসারের গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। অবশ্য এ ধরনের রোগী সংখ্যায় খুব বেশী নয়। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক রোগটা সারাতে পারলে ব্লাড প্রেসারও কমে।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা ছোটমামা, শুনেছি যাদের প্রেসার বেশী, তাদের নাকি 'থ্রম্বোসিস্' হবার সম্ভাবনাও বেশী ?

সত্যবাবু বললেন—'থ্রমবোসিস্', অর্থাৎ....

—অর্থাৎ রক্তনালীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে ছোট্ট ডেলা পাকিয়ে যাওয়া। ভয়ানক পাজি রোগ।

সত্যবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—তাহলে করোনারী থ্রমবোসিস্ মানে হার্টের রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়া?

পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমাটা মুছে নিল ছোটমামা।

—সাধারণতঃ যাদের হাই প্রেসার, তাদের রক্তনালীর ভেতরের গায়ে অমসৃণ-ভাবে চর্বি জমে। এই অবস্থাটা রক্ত জমাট বাঁধার পক্ষে সহায়ক। এ রকম অবস্থা যে কোন রক্তনালীর মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে। তবে বিপদ বেশী 'হার্ট' বা 'ব্রেনের' কোন রক্তনালীতে রক্ত ডেলা পাকিয়ে 'ক্লট' তৈরী করলে।

টুম্পা বললো—অন্য কোথাও 'থ্রমবোসিস' হয় নাকি?

—হতেই পারে। হাত বা পায়ের কোন রক্তনালীতে 'ক্লট' তৈরী হয়ে সেখানকার রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে থ্রমবোসিসের জন্যে হাত বা পায়ের অংশ বাদ দিতে হয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

সত্যবাবু বললেন—বলো কি?

ছোটমামা বলল—আরো খারাপ, যদি ঐ রকম কোন 'রক্তের ডেলা' ভাসতে ভাসতে ফুসফুসের কোন রক্তনালীতে আটকে যায়।

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন সত্যবাবু।

—আরও কত রকম হার্টের ব্যামো আছে কে জানে?

ছোটমামা হেসে ফেললো।

—তা যা বলেছেন। এ ব্যাপারে অন্ততঃ শ'খানেক ডাক্তারী মহাভারত আছে, আর মাসে মাসে হার্টের নানা খবরাখবর নিয়ে প্রকাশিত হয় এমন 'জার্নালে'র সংখ্যা বেশ কয়েক গন্ডা!

অবাক হয়ে টুম্পা বললো—এত অসুখের নাম মনে রাখো কি করে?

—সব খুঁটিনাটি কি আর মনে রাখা যায়? তবে বলা যায় হার্টের অসুখ-গুলোকে মোটামুটিভাবে চার পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায়।

সত্যবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন—কি রকম?

—যেমন ধরুন হার্টের আকৃতি যদি পাল্টে যায়। ছোট হয়ে যাওয়া, কিংবা বড় হয়ে যাওয়া অথবা জন্মগত কোনো ত্রুটি, সব এর আওতায় চলে আসবে। তারপরে ধরুন যে বিশেষ রাস্তায় হার্টের পেশীতে বিদ্যুৎ চলাচল করে, সেই রাস্তার গোলমাল।

সত্যবাবু হাসলেন।—রাস্তা থাকলেই গন্ডগোলও থাকবে।

ঠিক কথা। কিংবা ধরুন যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে তার পরিমাণের

তারতম্য। বাড়লেও বিপদ, কমলেও তাই। হার্ট ছুটবে ঘোড়ার মতো, নয় শম্বুকগতি। মাঝে মাঝে কিছু অতি উৎসাহী হার্টের দেখা মেলে, যেখানে হার্টের নানা জায়গা থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ তৈরী হচ্ছে। মানে প্রত্যেক অংশই নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতে থাকে। এছাড়া ওপরওয়ালার গন্ডগোল তো হতেই পারে। মানে ঐ 'কার্ডিওভ্যাসকুলার নিউরোসিস' আর কি।

—হাই তুললো ছোটমামা। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলেছি। এবার এক কাপ চা না পাওয়া পর্যন্ত আমি মৌনী থাকব!

স্নেহ অতি বিষম বস্তু !

এটা কি রকম হলো ?

—খবরের কাগজের ওপর নজর বুলিয়েই কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন সত্যবাবু।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ছোটমামা বললো—কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি ?

—আমি খবরের কাগজওয়ালার কথা বলছি। কতদিন বলেছি এ বাড়িতে 'স্টেটস্‌ম্যান' দেবে, কিন্তু কে কার কথা শোনে ? আজ 'অমৃতবাজার', কাল 'টেলিগ্রাফ', যা মনে হয়, তাই ফেলে দিয়ে চলে যায়। বহুকালের লোক, না-ও বলতে পারি না।

ছোটমামা বলল—বুড়ো মানুষ নিশ্চয় ? বয়স হয়ে গেলে ভুল একটু-আধটু হতেই পারে।

পাশ থেকে টুম্পা বলে উঠলো—ভুলে যাওয়া তো তবু ভালো। কিন্তু এক একজন বুড়ো মানুষ যা বদ্‌রাগী হয় না ? ক'দিন আগে বাসে করে ফিরছিলাম, এক 'দাদুকে' দেখলাম। কি বদ্‌মেজাজী ! বসার 'সিট' না পাওয়ায় ঝগড়া করলো, খুচরো পয়সায় ভাড়া দিতে বলায় কণ্ডাকটারকে প্রায় মারে আর কি, শেষে নামার সময়, একটা 'স্টপেজ' বেশী নিয়ে আসায় ভয়ানক রেগে গিয়ে কণ্ডাকটারের ব্যাগটা উলটে ফেলে নেমে গেলেন—অবিশ্রান্ত গালাগালি দিতে দিতে !

সত্যবাবু বললেন—আমি ভাবছি তার বাড়ির লোকজনের কথা। ওরকম মানুষকে সামলানোই তো মুশকিল !

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল ছোটমামা।—'অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস'। বুড়ো বয়সের রোগ।

টুম্পা বললো—সে কি ! আমি তো জানতাম 'অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস'

মানে রক্তনালীর গায়ে চর্বি জমা। এর থেকে হাই প্রেসার হয়। কিন্তু বদমেজাজের সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক আছে না কি ?

টেবিলের ওপর রাখা মসলাদানি থেকে একটু মৌরি তুলে নিতে নিতে ছোটমামা বললো—তোর জানাটা একদম সঠিক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম, কোলেস্টেরল, হায়ালিন—এ রকম নানা জিনিস জমে সব রক্তনালীর দেওয়ালই শক্ত হতে শুরু করে। ফলে রক্তচাপও বাড়ে—ডেকে আনে নানা উপসর্গ। যেহেতু রক্তচাপের সঙ্গে হার্টের সম্পর্কটা খুব বেশী, কাজেই 'অ্যাথেরোস্কেলেরোসিসের' সূত্র ধরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হার্ট-সংক্রান্ত অসুখবিসুখ আসে আগে। যেমন ধর, চর্বি জমার প্রবণতা সাধারণতঃ বেশী হয় হার্টের দেওয়ালের রক্তনালীর ভেতর। তার পরেই ধর যে সব রক্তনালীগুলো ব্রেনে রক্ত যোগান দিচ্ছে, যে কথা তোরা এক্ষুণি বললি, কাগজওয়ালা সব কথা মনে রাখতে পারছে না কিংবা বাসের সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কথা, তাদের আচরণের জন্যেও দায়ী ব্রেনে রক্ত চলাচলের মাত্রা কমে যাওয়া। ব্রেনের বিভিন্ন অংশ আছে তো ? কোন অংশে ঠিকমতো রক্ত চলাচল না হলে, সেখানে পরিমাণ মতো অক্সিজেন কিংবা খাবার পেঁছোবে না, ফলে আচার-আচরণের মধ্যেও পরিবর্তন শুরু হবে।

সত্যবাবু বললেন—ভাবাই যায় না যে রক্তনালীর অসুখে মেজাজ মর্জি পাল্টে যায় !

—শুধু তাই নয়। অনেকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয় পায়ে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হয়তো হঠাৎ মনে হলো একটা পা ভারী হয়ে আসছে, তার সঙ্গে পায়ে ব্যথা, টান ধরে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলে আবার ঠিক হয়ে গেল।

টুম্পা অবাক হয়ে বলালা—আমার তো মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা পায়ের মাসলে টান ধরে। কি যন্ত্রণা !

ছোটমামা হেসে ফেলল।

—দূর বোকা। এটা হয় রক্তবহা নালীতে খিঁচুনীর জন্যে। রক্তনালীর সঙ্গে নার্ভের যোগাযোগ থাকে তো ? শোওয়ার দোষেই হোক বা যে কারণেই হোক, নার্ভ উত্তেজিত হলে ঐ রকমটা ঘটতেই পারে। তবে প্রসঙ্গটা তুলে ভালই করেছিস্—'অ্যানজাইনা' ব্যথার কারণটাও অনেকটা একই রকম।

'অ্যানজাইনা' মানে মাঝে মাঝে বুকের বাঁ-দিকে ব্যথা তো ?—নিজের বুকের বাঁ-দিকে হাত বোলালেন সত্যবাবু।

—ব্যথা তো হাজারটা কারণে হতে পারে। বিশেষ বিশেষ নার্ভের প্রদাহ কিংবা পাঁজরের মাসলে ব্যথা, এ সবই কিন্তু বুকে ব্যথার কারণ হতে পারে।

'অ্যানজাইনার' ব্যথার সঙ্গে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট থাকে। তাছাড়া এ ব্যথা হবার কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময় থাকে।

সত্যবাবু বললেন—কি রকম ?

—ধরুন, এই ব্যথা সাধারণতঃ ওঠে কোন কাজ করার সময়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ, হঠাৎ বুকের বাঁ-দিকে চিনচিন্ করে ব্যথা উঠলো। কারু কারু আবার ব্যথাটা হয় পিঠের বাঁ-দিক ঘেঁষে, অথবা ব্যথাটা বাঁ-হাত দিয়ে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কারু বা ব্যথা হয় না, ঐ সময় মনে হয় বুকে একটা চাপ ধরছে।

সত্যবাবু বললেন—রাস্তাঘাটে এমন হলে তো মুশকিল ?

—সে তো নিশ্চয়। তবে এক্ষেত্রেও একটা মানসিক ব্যাপার আছে। ধরুন কলকাতা শহরের ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্র্যাফিক সিগন্যাল পার হতে গিয়ে কারু অ্যানজাইনার ব্যথা উঠেছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভাবনা থাকে, পরবর্তীকালে খুব ভিড় রাস্তায় ট্র্যাফিক সিগন্যাল পার হতে গিয়ে তার আবার অ্যানজাইনার ব্যথা উঠতে পারে। প্রথম স্মৃতির কথা মনে পড়ল—ঠিক সেই মুহূর্তের ঘটনার দৃশ্যপট এবং আগের দৃশ্যপট অনেকটা একই রকম, ফলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মোটেই বিচিত্র নয়।

কিন্তু এই রোগটা হবার কারণ কি ?—টুম্পার জিজ্ঞাসা।

—আসলে ঐ সময়ে হঠাৎ করে হার্টের দেওয়ালের রক্তনালীর সংকোচন হয়। আগেই বলেছি, বিশেষ কিছু কিছু কেন্দ্র আছে 'ব্রেনে', যারা উত্তেজিত হলে সাময়িকভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যাদের হার্টের রক্তনালীতে চর্বি জমতে শুরু করেছে, তাদের পক্ষে অবস্থাটা আরো বিপদজনক। কারণ এমনিতেই রক্তনালীর দেওয়াল মোটা হয়ে রক্ত চলাচলের রাস্তা সরু হয়ে গেছে, রক্তনালীর সামান্য সংকোচনই হার্টের কোন অংশে রক্ত চলাচলে ভীষণভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যখনই হার্টের পেশীতে ঠিক মতো রক্ত চলাচল করতে পারছে না, ডাক্তারী পরিভাষায় তাকে বলছি 'কার্ডিয়াক ইস্কিমিয়া'।

তা তো বুঝলাম।—গালে হাত রেখে প্রশ্ন করলো টুম্পা : কিন্তু হঠাৎ করে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে অ্যানজাইনার ব্যথা তৈরী করবে কেন ?

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিল ছোটমামা।—অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে অনেক সময় আমাদের ছোটখাট ভুল এ ব্যাপারে দায়ী হয়।

সত্যবাবু বললেন—কি রকম ?

—যেমন ধরুন, অনেকক্ষণ কিছু না খেলে পেট খালি হয়ে যায়। পাকস্থলীর সংকোচন—নার্ভ দিয়ে খবর পেঁছে গেল 'ব্রেনে'। এখন 'ভেগাস' বলে একটা 'নার্ভ' আছে যার একটা শাখা গেছে পাকস্থলীতে, অন্যটা হার্টে।

এই ভেগাসের রাস্তা ধরে পাকস্থলীর সংকোচন, হার্টের রক্তনালীতে আবিষ্ট হতে পারে। অবশ্য এগুলো খুব জটিল ডাক্তারী ব্যাপার!

সত্যবাবু বললেন—কারণ যাই হোক, খবরটা দরকারী। যাদের মাঝে মাঝে বুকে চিনচিনে ব্যথা ওঠে, তাদের খালি পেটে থাকা চলবে না। তাই তো?

—শুধু তাই নয়, ধূমপানের অভ্যেস থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে চিরকালের মতো। তামাকের নিকোটিন অতি খারাপ জিনিস। এর বদগুণ হল যে এটি হার্টের রক্তনালীদের সংকুচিত করে। এছাড়া অনেকে নানা চিন্তায় থাকেন, নানা চিন্তা ভাবনাও অ্যানজাইনার ব্যথা তৈরীতে সাহায্য করে। খাওয়াদাওয়া, বিশেষ করে রাত্রে খুব ভরপেট খাওয়া ভাল না। পেটে 'গ্যাস' হয়ে পাকস্থলীতে অস্বোয়াস্তি—যার থেকে 'ভেগাস' মারফৎ 'অ্যানজাইনা' শুরু হতে পারে।

টুম্পা বলল—তাহলে খুব জোর ছুটলে বা ভারী ধরনের কাজ করলেও বুকের ব্যথা শুরু হতে পারে?

সাধারণ মানুষের হবে না, কিন্তু যাদের হার্ট দুর্বল, তাদের হতে পারে। এই কারণেই হার্টের রোগীদের বলা হয় খুব জোরে ছুটবেন না, খুব ভারী কাজ করবেন না।

সত্যবাবু হাসলেন।—তোমার কথা সবই মানছি। সব ব্যাপারেই সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু চিন্তাকে কমাবে কি করে? আমার এক বন্ধু আছে, নাম অসিত। অসিত মাঝে মাঝেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে ওপর থেকে নাকি নিচে পড়ে যাচ্ছে। চিন্তা তো স্বপ্নের মধ্যেও আসে?

ছোটমামা গম্ভীর হয়ে গেল।

—ভাল লক্ষণ না। কোন কারণে ওনার মনে কিছু একটা ভয় বা নিরাপত্তা-বোধের অভাব আছে। ঐ রকম স্বপ্নের মূলেও ওনার সেই সব চিন্তা ভাবনা।

সত্যবাবু বললেন—ভয় তেমন কিছু না, দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এই যা।

—তবু আপনি ভদ্রলোককে বলবেন একটু 'চেক-আপ' যাতে করিয়ে নেন। রাত্রে ঘুমের মধ্যে 'ভেগাস'-নার্ভ চঞ্চল হয়ে পড়ছে। এটা ভালো না। যেদিন রাত্রে ঐ রকম স্বপ্ন দেখবেন, ওনাকে বলবেন, একটু খেয়াল করে পালস্‌টা দেখতে। যদি সে সময় 'পালস্ বিট' ষাটের নিচে নেমে যায়, খুব সাবধান। সেক্ষেত্রে আগে ভাগেই ডাক্তার দেখানো ভালো। ভবিষ্যতে হয়তো একটা 'হার্ট-ব্লক' হওয়া বিচিত্র নয়। আমার কথাটা জ্যোতিষীদের মতো শোনালেও আপনার বন্ধুকে কথাটা বলে রাখবেন।

ছোটমামা উঠে দাঁড়ালো।—আজ উঠি। সামনের সপ্তাহে আবার আসবো।



ব্রেক-ডাউন এবং সার্ভিস ভ্যান !

—মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে হে। মানুষের জীবন তো নয়, পদ্মপাতায় যেন জল।

সত্যবাবুর গলাটা যেন কেমন ধরা-ধরা শোনাচ্ছিল।

ছোটমামা আস্তে আস্তে টুম্পাকে জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি ?

—গত পরশু অসিতকাকু হঠাৎ মারা গেলেন। তুমি অসিতকাকুকে চিনতে কি ? বাবার সঙ্গে পাশাপাশি টেবিলে কাজ করতেন। সেদিন দুপুরবেলা দুজনে এক সঙ্গে চা খেতে খেতে অসিতকাকুর বুকে ব্যথা ওঠে—অজ্ঞান হয়ে যান। 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে' নিয়ে যেতে যেতেই সব শেষ। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসতেন। ডাক্তারবাবু বলেছেন, 'ম্যাসিভ হার্ট ব্লক।'

গাবলু এতক্ষণ চুপচাপ এক পাশে বসেছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো—ছোটমামা, 'ম্যাসিভ হার্ট ব্লক' কি ?

ছোটমামা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—হার্টের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ চলে জানিস তো ? ডানদিকের অলিন্দে আছে 'সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড', তার থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে নিলয়ে। কোন কারণে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড যদি বিদ্যুৎ তৈরী করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা হার্টের পেশীতে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে অলিন্দ থেকে নিলয়ে বিদ্যুৎ চলাচল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার নাম 'হার্ট ব্লক'।

টুম্পা বললো—অসিতকাকুর আগে তো কখনো হার্ট অ্যাটাক বা ঐরকম হয়েছে বলে শুনি নি ?

ছোটমামা জিজ্ঞাসা করলো—ওনার বয়স কত হয়েছিল ?

সত্যবাবু উত্তর দিলেন—কতই বা হবে ? বড় জোর পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ বছর ! দারুণ পরিশ্রম করতে পারতো, সর্দি-জ্বর ছাড়া কিছুতে ভুগেছে বলে মনে পড়ে না।

চিন্তিতভাবে কপালে টোকা দিল ছোটমামা।

--আসলে এই হার্ট অ্যাটাক রোগটাই বড় পাজি। পঞ্চান্ন ষাট বছরে যাঁদের প্রথম অ্যাটাক হয় তাঁরা সাধারণত প্রথম অ্যাটাকটা পার হয়ে যান। কিন্তু কম বয়সে অর্থাৎ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে যাঁদের প্রথম অ্যাটাক হয়, তাঁদের মধ্যে বাঁচার হার নেহাতই কম। কারণ হচ্ছে, বয়স যতো বাড়ে হার্টের মধ্যেকার ছোটখাট রক্তনালীতেও রক্ত চলাচল বাড়তে থাকে। প্রধান রক্তাবহা নালীগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে তো! এই ছোটখাট রক্তনালীগুলোর মধ্যে রক্ত চলাচল অর্থাৎ যাদের বলা হয় 'কোল্যাটারাল সারকুলেশন'—এগুলোই বয়স্কদের প্রথম অ্যাটাক থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

টুম্পা বললো—ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো তো?

—ধর, হঠাৎ করে রক্ত জমাট বেঁধে 'করোনারী ধমনীর' মানে যে রক্তনালী দিয়ে রক্ত হার্টের পেশীতে যায়, তার মুখটা বন্ধ হয়ে গেলে হার্টের পেশীতে রক্ত চলাচল যাবে বন্ধ হয়ে। এ-অবস্থায় যদি 'কোল্যাটারাল'-গুলো খোলা থাকতো তাহলে রক্ত সেই রাস্তা ধরে হার্টের পেশীতে গিয়ে তখনকার মতো অবস্থা সামাল দিতে পারতো। যাঁদের বয়স কম, তাঁদের এই 'কোল্যাটারাল'-গুলো ঠিক মতো চালু না থাকায় বাঁচার সম্ভাবনা কম। বড় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম থাকলে পাশের গলিগুলোই তো ভরসা!

আচ্ছা ছোটমামা,—টুম্পা হঠাৎই জিজ্ঞাসা করেঃ সাধারণত দেখা যায় হার্ট অ্যাটাকে ছেলেরাই মারা যায় বেশী, মেয়েদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের খবর শোনা যায় না বললেই চলে। এর কি কোন কারণ আছে?

ছোটমামা চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো—আসলে মাঝবয়সে মেয়েদের শরীরে বিশেষ একটা হরমোন, 'ইস্ট্রোজেন' বেশী থাকায় রক্তনালীতে চর্বি বা কোলেস্টেরল জমতে পারে না, অন্তত বিজ্ঞানী মহলে তাই বিশ্বাস। ফলে মাঝবয়সী মহিলাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও কম। তা বলে বয়স্কাদের নয়।

সত্যবাবু এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন—হার্ট অ্যাটাকের কি কোন পূর্বাভাষ পাওয়া যায়? অবশ্য এ ব্যাপারটা আমার আর বিশ্বাস হয় না, অসিতের ব্যাপারটা তো চোখের সামনে দেখলাম।

ছোটমামা বললো—একেবারে উপসর্গ থাকে না যে তা নয়, তবে মুশকিল হচ্ছে তার বহিঃপ্রকাশটা আমরা দেখতে পাই না। আর যখন সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায় ফল হয় মারাত্মক। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কিন্তু শরীর সম্বন্ধে বড় কম সচেতন। উপসর্গ দেখা না দিলে ডাক্তারের কাছে যাব না। অথচ বাইরের দেশে দেখুন, যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপর, তাঁরা নিয়মিত স্বাথ্য পরীক্ষা করান, নিয়মিত হাঁটা চলা বা সাঁতারের অভ্যাস রাখেন, খাওয়া-দাওয়াও করেন পরিমিত।

শুনেছি মাঝে মাঝে 'ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম' করালে চিন্তা কমে। কিন্তু আমাদের এখানে ঐসব ব্যাপারে খরচের বহর তো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।—সত্যবাবু একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিলেন।

—সে তো নিশ্চয়ই। হার্ট অ্যাটাকের আগেই কিন্তু ই. সি. জি.তে 'ইস্কিমিয়া' বা 'ইনফার্কশনের' লক্ষণ ধরা পড়তে পারে।।

টুম্পা বললো—'ইস্কিমিয়া' শব্দটা চিনি, যার মানে হার্টের কোনো অংশে রক্ত চলাচল কম হচ্ছে। কিন্তু 'ইনফার্কশন' ব্যাপারটা কি?

—'ইস্কিমিয়া' হলে হার্টের সেই অংশের উপযুক্ত পুষ্টি হবে না, ফলে সেই জায়গার কোষগুলোও শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে 'ইনফার্কশন'।

টুম্পা বললো—অনেক সময় কতকগুলো ছোট ছোট লক্ষণ দেখা যায়, যেগুলোকে কেউ খেয়াল করে না, যেমন মাঝে মাঝে বুকে চিন্চিনে ব্যথা! তাই না ছোটমামা?

ছোটমামা একটু চিন্তা করে বললো—আরও আছে। যেমন ধরু, মাঝে মাঝে যদি মনে হয় দম আটকে আসছে, কিংবা হঠাৎ করে ঘাম দেওয়া, অথবা বুকের মাঝখানে ব্যথা বাঁ-কাঁধের দিকে যাচ্ছে, সঙ্গে গা বমি ভাব, এগুলো হলে বুঝতে হবে হার্টের ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার। অনেকে বদ্হজম বা ঐরকম কিছু ভেবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়।

সত্যবাবু বললেন—কিন্তু একবার অ্যাটাক হয়ে গেলে তো কিছু করার থাকে না?

—প্রায় সময়ই ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায় বটে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, হার্ট অ্যাটাক হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানুষ মারা যায় না। তারপরেও এক থেকে তিন ঘণ্টা সময় থাকে।

—'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক' অর্থাৎ হার্টের পেশীর মধ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, এটা কিন্তু বেশ বিরল ঘটনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হার্টের বৈদ্যুতিক স্পন্দনের গোলযোগটাই আসল কারণ। অনেকটা ইলেকট্রিক লাইনে 'লুজ কনট্যাক্ট্' ধরনের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপত্র নিলে সাধারণতঃ রোগী বেঁচে যায়।

টুম্পা বললো—এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছে হার্ট অ্যাটাকের বাহাত্তর ঘণ্টা পরে হাসপাতালে রোগী মারা গিয়েছে?

ছোটমামা বললো—সেটা অনেকটাই সম্ভাবনা মানে চান্সের ব্যাপার। হার্টের বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ওষুধপত্র দিয়ে সারালেও অ্যাটাকের পর অনেক সময় দেখা যায়, হার্টের স্পন্দনের ছন্দ ওলটপালট হয়, মাঝে মাঝে 'বিট' ছেড়ে যায়। সেই সময় সাবধান না হলে ফলটা হয় মারাত্মক। অবশ্য

আজকাল হাসপাতালগুলোতে 'করোনারী কেয়ার ইউনিট' হয়েছে। সেখানে ঐ ধরনের বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা সকলের মনে রাখা দরকার, বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখা উচিত সবার আগে। যেমন ধরু, বেশীর ভাগ হার্ট অ্যাটাক ঘটে রাত্রে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় সেদিন হয়তো খাওয়া-দাওয়া বেশী হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং, যাদের একটু বেশী বয়স হয়েছে, তাঁদের রাত্রে খাবার খেতে হবে পরিমাণ মতো, প্রত্যেকের উচিত কাছাকাছি কোন টেলিফোন বা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, যাতে রাতবিরাতে তাঁর সাহায্য পাওয়া যায়। বিপদ দেখে বুদ্ধি হারিয়ে একে ওকে ডাকাডাকি, এতে সময় চলে যায়, বিপদেরও আশংকা যায় বেড়ে।

সত্যবাবু বললেন—এ প্রসঙ্গে তোমায় তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাদের দেশে তো হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা কম নয়? আর অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে বেশী রাত্রে। ডাক্তার ডাকা, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া, এসব করতে এক আধ ঘণ্টা সময় লেগে যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার, এই সময়টা রোগীর জন্য করণীয় কি কিছুই নেই?

ছোটমামা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। এবার সোজা হয়ে বসল।

—নিশ্চয়ই। বিপদে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে আমরা ছোটাছুটি করি, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু প্রাথমিক ব্যবস্থা নিলে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু অন্ততঃ তিরিশ শতাংশ কমানো যাবে বলে আমার বিশ্বাস। একটা ঘটনার কথা বরং আপনাকে বলি। দিন তিনেক আগের ঘটনা। রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা হবে। আমাদের পাড়ার একটি ছেলে এসে বললো, তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি চলুন, বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

টুম্পা বলল—হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপার? যখন তখন হতে পারে না কি?

ছোটমামা বললো—তা তো পারেই। এ রোগগুলোর লক্ষণই তো তাই। কখন কিভাবে হবে, আগে থেকে কিছুই আঁচ পাওয়া শক্ত। যাই হোক, ভদ্রলোককে আমি চিনতাম, আগে থেকেই হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগতেন। তাড়াতাড়ি এক পরিচিত হার্টের ডাক্তারকে টেলিফোনে খবর দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি যা সন্দেহ করেছি তাই, স্টেথো দিয়ে হার্টের শব্দ পাচ্ছি না।

গাবলু বললো—তখন তুমি কি করলে?

—করণীয় তখন একটা জিনিসই থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস ও হার্টের গতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

সত্যবাবু বললেন—এ জিনিসটা জানা জরুরী। এ পরিস্থিতিতে পড়লে কি করতে হবে বল দেখি!

—প্রথমতঃ রোগীকে শক্ত মেঝেতে শুইয়ে দিতে হবে, মাথায় বালিশ থাকবে না। হাঁটু ভাঁজ করে দিন বা কাউকে বলুন পা-টা তুলে ধরতে যাতে পা-টা হার্টের লেভেলের ওপরে থাকে।

—ইতিমধ্যে রোগীর নাকটা দুটো আঙুল দিয়ে বন্ধ করে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর চেষ্টা করুন। বুক ভরে দম নিয়ে জোরে দম ছাড়ুন রোগীর মুখে, দেখবেন বুকের খাঁচাটা ফুলে উঠবে অর্থাৎ ফুসফুসে হাওয়া ঢুকল। নিশ্বাস এমনিতেই পড়বে পাঁজরা আর ডায়াফ্রামের চাপে। এটা করতে হবে মিনিটে পনেরো থেকে বিশবার।

গাবলু বললো—এ তো শ্বাসপ্রশ্বাসের বিকল্প ব্যবস্থা হলো! কিন্তু হার্ট?

—তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। হার্ট যদি থেমে যায়, প্রথমেই একটা জোরে ঘা মারতে হবে বুকের বাঁদিকে, হার্ট বরাবর। তবে এমন জোরে না হয় যাতে পাঁজরই ভেঙ্গে যায়। এটার উদ্দেশ্য, বাইরে থেকে যান্ত্রিকভাবে হার্টকে চালানোর চেষ্টা করা। এরপর 'ম্যাসেজ' করতে হবে। এরও বিশেষ কায়দা আছে।

টুম্পা বলল—ঠিক কোন জায়গাটায় 'ম্যাসেজ' করা দরকার?

ছোটমামা উত্তর দিল—বুকের ঠিক মাঝ বরাবর একটা হাড় আছে, চলতি ভাষায় যাকে বলে 'ব্রেস্ট-বোন'। ব্রেস্ট-বোনের ইঞ্চি তিনেক ওপরে হার্ট বরাবর বাঁ হাতটা রাখ। আঙুল থুতনির দিকে, কব্জি পেটের দিকে। বাঁ-হাতের ওপর ডান হাত রাখ উপুড় করে, এবার কব্জি থুতনির দিকে। শরীরের ভার দিয়ে ব্রেস্ট-বোনকে চাপ, অন্ততঃ সেটা যাতে ইঞ্চি দুই নিচের দিকে নামে।

গাবলু বললো—এতে লাভ?

ছোটমামা বলল—চাপের জন্য রক্ত বেরিয়ে ধমনীতে যাবে, বিশেষতঃ ক্যারোটিড ধমনী দিয়ে মাথায় এবং ফুসফুসীয় ধমনী দিয়ে ফুসফুসে। কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, সুতরাং সেখান থেকে অক্সিজেন মিশবে রক্তে। হাতের চাপ ছাড়লে পাঁজরা আর পেশীদের স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্য তারা নিজেদের জায়গায় ফিরবে, হার্টের ওপর চাপ কমবে, মহাশিরা দিয়ে রক্ত ফিরবে হার্টে। আগেই বলেছি পা থাকবে হার্টের লেভেলের ওপর, ফলে রক্ত হার্টে ফিরবে চটপট্।

সত্যবাবু বললেন—এই ম্যাসেজ চলবে কি হারে?

ছোটমামা বলল—মিনিটে অন্ততঃ ষাট থেকে সত্তরবার। অবশ্য কিভাবে ম্যাসেজ করা দরকার, একজন ডাক্তারের কাছে হাতে-কলমে শিখে নেওয়া উচিত।

টুম্পা বললো—তোমার কাহিনী তো শেষ হল না। সেই ভদ্রলোকের কি হলো ?

—কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস আর কার্ডিয়াক ম্যাসেজ চালালাম আমরা দুজন। ইতিমধ্যে আমি একটা ইনজেকশন দিয়েছিলাম যাতে হার্টের পেশীতে রক্ত চলাচল বাড়ে। কার্ডিওলজিস্ট বন্ধু এসে ই. সি. জি. করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠালেন। ভদ্রলোক এখন ভালোই আছেন, অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজে মিটবে না। ডাক্তাররা 'পেস-মেকারের' কথা বলেছে। কিছু না হলেও আট-দশ হাজার টাকার ধাক্কা।

অথচ দেখো, ব্যাপারটা কি সামান্য ! হার্টের অনিয়মিত স্পন্দনকে নিয়মিত করার জন্য হার্টে ছোট ছোট 'ইলেকট্রিক শক' দেওয়া ছাড়া পেস-মেকারের আর কোন কাজ নেই। তাই তো ?—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন সত্যবাবু।

—হ্যাঁ, আপাতভাবে সামান্য মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু ভয়ংকর রকম জটিল।—ছোটমামা মুচকি হাসে।

—কি রকম ?

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছে ছোটমামা।

—হার্টের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর বিভিন্ন অংশ মানে অলিন্দ বা নিলয় নিজেদের ইচ্ছেমতো, নিজস্ব গতিতে সংকুচিত প্রসারিত হতে পারে। এছাড়া হার্টের সঙ্গে বিভিন্ন স্নায়ুর যোগাযোগ আছে, কেউ সমানে চেষ্টা করছে হার্টকে তাড়াতাড়ি চালাতে, আবার কেউ বা ফাঁক পেলেই হার্টের গতিকে মন্থর করে দেবে। এই সব নানান ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করছে হার্টের নিজস্ব 'পেস-মেকার' অর্থাৎ 'সাইনো-অরিকিউলার নোড'। তার কাজ বাইরে থেকে বসানো পেস-মেকার দিয়ে সামলানো মুস্কিল বই কি ! নানা কার্যকলাপ যোগ-বিয়োগ করে 'নীট ফল' অর্থাৎ প্রতি মিনিটে বাহাত্তরবার সংকোচন-প্রসারণ করানো কি সোজা ব্যাপার ?

চায়ের পেয়ালা দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে টুম্পা বললো—কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে ছোটমামা। আমার বন্ধু মিতা, ওর বাবার বুকে 'পেস-মেকার' বসানোর কথাবার্তা চলছে। এক ডাক্তার বলেন, বসানো দরকার, অন্য ডাক্তার বলেন এখন দরকার নেই। কি ঝামেলার ব্যাপার বল তো ? ওরা এখন কোন দিকে যায় ? তুমি বরং ছোট্ট করে আমায় বুঝিয়ে দাও তো কখন সত্যি সত্যি 'পেস-মেকার' বসানো দরকার ? আমি অন্ততঃ মিতাকে সেটা বলতে পারবো।

ছোটমামা হেসে ফেললো।

—আসলে রোগীর অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দুজনেই যদি

হার্টের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হন, তবে আমার মত, যাঁর অভিজ্ঞতা বেশী তাঁর মতটা নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিংবা তৃতীয় কোন বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা হচ্ছে মূলতঃ দুটো অবস্থায় 'পেস-মেকার' বসান খুব দরকার। এক হচ্ছে হার্ট ব্লক.......

টুম্পা বললো—অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে 'সাইনো অরিকিউলার নোড' থেকে বৈদ্যুতিক খবরাখবর সারা হার্টে ঠিক মতো ছড়িয়ে পড়তে পারছে না ?

—ঠিক তাই। কতটা হার্ট ব্লক হয়েছে, মানে একদম খবর যাচ্ছে না, কিংবা কম পরিমাণে খবর যাচ্ছে অথবা মাঝে মাঝে লাইন কেটে যাচ্ছে, সেটা বিবেচনা করে পেস-মেকারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অন্য রোগটা কি ?—সত্যবাবুর জিজ্ঞাসা।

—সেটাও কাছাকাছি ব্যাপার। আমরা বলি 'কার্ডিয়াক অ্যারিদ্মিয়া' অর্থাৎ যখন অলিন্দ ও নিলয় ছন্দ মেনে কাজ করে না, একজন নিজের খেয়ালে চলতে শুরু করে। ফলটা বুঝতেই পারছেন, হার্টের এক একটা অংশ খুশিমতো চললে হার্টে রক্ত ফিরে আসা বা পাম্প করে শরীরে রক্ত পাঠানো—এই দুয়ের ভেতর একটা ফারাক বা ছন্দপতন ঘটে যাবে, যার ফলে প্রাণ নিয়ে টানাটানিও বিচিত্র নয় !

টুম্পা বললো—পেস-মেকার বসানর সময় আসলে কি করা হয় ?

এখন তো পেস-মেকার এবং তার যান্ত্রিক শক্তির উৎস মানে ব্যাটারী, দুটোই শরীরের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। 'ইলেকট্রোড' মানে যে অংশটা দিয়ে বিদ্যুৎ সংকেত পাঠানো হয় সেটাকে হার্টের সঙ্গে ছুঁইয়ে দেওয়া হয়, সরাসরি অপারেশন করে বা 'ক্যাথেটারের' মাধ্যমে কোন রক্তনালী দিয়েই হোক। ব্যাটারী সুদ্ধ মূলযন্ত্রটা বুকের বাঁ-দিকের দেওয়ালে বা পেটের দেওয়ালে বসিয়ে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট অপারেশন করে।—ছোটমামা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে দুনিয়ায় যত লোকের বুকে পেস-মেকার বসান আছে তা একইভাবে কাজ করছে ?

ছোটমামা বলালা—ঠিক তা নয়। প্রয়োজন অনুসারে পেস-মেকারেরও শ্রেণীভেদ আছে। কোনটা সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট হারে স্পন্দন তৈরী করে, কোনটা আবার চালু হয় 'হার্ট রেট' ষাটের নিচে নামলে তবেই। এগুলোকে বলে 'ডিম্যান্ড পেস-মেকার',। তেমনি আবার অলিন্দ বা নিলয়—যেটা গোলমাল করছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আছে 'সিনক্রোনাস্ পেস-মেকার'।

টুম্পা বললো—ব্যাপারটা বুঝলাম না।

—অর্থাৎ এদের স্পন্দন হারটা এমনভাবে ঠিক করা আছে যা শুধুমাত্র

অলিন্দ বা নিলয়কে উত্তেজিত করবে। ধর্, একটা পেস-মেকারের ছন্দ এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হলো যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামে যেই প্রথম তরঙ্গটা আসবে তার ঠিক দশমিক দুই সেকেন্ড পরে পেস-মেকার থেকে বিদ্যুৎ-সংকেত আসবে।

—আচ্ছা ছোটমামা, যাদের বুকে পেস-মেকার বসান হবে তারা তো বেশী দৌড়োদৌড়ি করতে পারবে না ?

—ঠিক বলেছিস্। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল তাই। যেহেতু মানসিক উত্তেজনা বা দৌড়ঝাঁপ করলে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে, হার্টকে বেশীবার পাম্প করতে হয়, আজকাল এক ধরনের পেস-মেকার তৈরী হয়েছে যেগুলো দুরকম হারে স্পন্দন পাঠাতে পারে। ধর্, সত্তর আর নব্বুই। স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে সত্তরবার সংকেত পাঠাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজন হলেই সে নব্বুইবার সংকেত পাঠাতে পারে। শুধু বুকের ওপর একটা সুইচ থাকে সেটাকে ঠেলে দিলেই হলো। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে সুইচটা উল্টোদিকে ঠেললেই হবে। তা-ছাড়া বিজ্ঞানীরা এখন 'কম্পিউটারাইজড্' পেস-মেকার তৈরী করেছেন। কম্পিউটার মানে ক্ষুদে কম্পিউটার। হার্ট কিভাবে কাজ করছে, তার একশো আঠাশ দিনের তথ্য মনে রাখতে পারবে এই ক্ষুদে কম্পিউটার।

এত রকম পেস-মেকার !—সত্যবাবু আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন।

ছোটমামা হাসল।

—এটুকু শুনেই অবাক হচ্ছেন ? পেস-মেকার দিয়ে তো সব রকম হার্টের অসুখ সারবে না ? সময় সময় ডাক্তাররা হার্টের ওপর ছুরি কাঁচিও চালান। হার্ট অপারেশনের কাহিনী নিয়ে তো রীতিমত গল্প লিখে ফেলা যায়। আর একদিন বরং সে গল্প বলব।



খোদার ওপর খোদকারি

খবরটা শুনেছো ছোটমামা ? গাবলু তোমাকে বলেছে কি ?—ছোটমামা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই টুম্পার প্রশ্ন।

সমাচারটি কি ?—আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসলো ছোটমামা।

—গাবলুর বন্ধু অন্তুকে চেনো তো ? অন্তুর জ্যাঠামশায়ের হার্টে একটা অপারেশন হয়েছে ! ভালভ্ না কিসের গণ্ডগোল ছিল—

সত্যবাবু বললেন—হ্যাঁ, এ ব্যাপারটার তারিফ করতে হয়। একেই বলে খোদার ওপর খোদকারি ! আজকের দিনে সার্জেনরা—

আচ্ছা ছোটমামা—মাঝপথে বলে ওঠে টুম্পা ঃ কোন রোগীর হার্টে অপারেশনের দরকার আছে কিনা, সেটা ডাক্তাররা বোঝেন কি করে ? সব 'কেস'ই তো অপারেশনের 'কেস' নয় ?

সে তো নিশ্চয়। ছোটমামা বললো ঃ প্রথমেই জানা দরকার হার্টের কোন্‌খানে, কতটা জখম হয়েছে। এর জন্য দরকার ই-সি-জি—এটা ত তোরা জানিসই ?

সেদিনই ত বলছিলে হার্টের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের রেকর্ড ওটা। হার্টের কোন অংশে গণ্ডগোল দেখা দিলে ই-সি-জি রেকর্ডেও তার ছাপ পড়বে। ঠিক বললাম তো ?—ছোটমামার দিকে তাকায় টুম্পা।

—আজকাল অবশ্য 'আর্টিরিওগ্রাফি' করা হচ্ছে, অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের রঙ ইঞ্জেকশন দিয়ে ধমনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যেটা রঞ্জনরশ্মির সামনে অস্বচ্ছ। এরপর বিশেষ যন্ত্রের 'এক্স-রে' চোখ দিয়ে দেখা হয় সেটা ধমনী বা শিরার মধ্যে কিভাবে যাচ্ছে। 'করনারী ধমনী'—মানে যে রক্তনালীগুলো হার্টের পেশীতে রক্তের যোগান দেয়, তাদের মধ্যে দিয়ে ঠিকমত রক্ত চলাচল করছে কি না, সেটা বোঝার পক্ষে এটা খুব ভালো উপায়। এছাড়াও রোগীর স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, রক্তের নানা পরীক্ষা—এসব তো আছেই ! সব কিছু পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা যদি

মনে করেন 'অপারেশন' না হলেই নয়, রোগীকে বাঁচানো মুশ্‌কিল, তবেই হার্টের ওপর ছুরির কাঁচি চালানো হবে।

সত্যবাবু এতক্ষণ ছোটমামার কথা শুনছিলেন। ছোটমামা থামতেই জিজ্ঞাসা করলেন—সাধারণতঃ কি ধরনের হার্টের রোগে অপারেশন দরকার হয়?

ছোটমামা একটুক্ষণ চিন্তা করে বললো—অনেক সময় আমরা বলি না, জন্মগত হার্টের দোষ? এই সব জন্মগত আকার আকৃতির গোলমালে হার্ট-সার্জারি খুব দরকারী হয়ে পড়ে। তেমনি আবার করনারী ধমনীতে কোন বাধা থাকলে হার্টের পেশীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবার 'রিউম্যাটিক ফিভার' মানে বিশেষ ধরনের জীবাণুর আক্রমণে হার্টের অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 'অপারেশন' না করে উপায় থাকে না।

টুম্পা বললো—তুমি ঐ যে বললে জন্মগত হার্টের দোষ, সেই ব্যাপারটা কি?

আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসলো ছোটমামা।—মোটামুটি হিসেব বলে প্রতি হাজারটা বাচ্চার মধ্যে প্রায় আটজন হার্টের গণ্ডগোল নিয়ে জন্মায়। অর্থাৎ কিনা মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চা যখন বড়ো হচ্ছে, তার হার্টের অংশবিশেষ পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠে না।

—অর্থাৎ?

—যেমন ধর্, হার্টের মধ্যে ডান আর বাঁদিকের কুঠুরীগুলোর মধ্যে 'পার্টিশন' দেওয়াল থাকে। রক্ত তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। অথচ জন্মানোর পরে পরীক্ষায় ধরা পড়লো—ঐ 'পার্টিশন' মানে দেওয়ালে একটা ছোট্ট ফুটো আছে। কিংবা ধর্, হার্টের কোন একটা 'ভালভ্' ঠিকমত আকারের নয়, ফলে রক্ত চলাচল আটকে যাচ্ছে। সেখানে অপারেশন করে 'ফুটো'টা বন্ধ করে দেওয়া হল বা হার্টের 'ভালভ্', এমন কি ছোটখাট রক্তনালীও, কৃত্রিম ভালভ্ বা প্লাষ্টিকের রক্তনালী বসিয়ে পাল্টে ফেলা হল।

সত্যবাবু বললেন—যে সব বাচ্চা হার্টের গণ্ডগোল নিয়ে জন্মায়, তারা সাধারণতঃ বাঁচে না।

বিশেষ করে আমাদের মত গরীব দেশে ত বটেই—গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ালো ছোটমামা: জন্মের সময় যে সব 'ব্লু-বেবি' হয়, মানে যাদের ঠোঁট বা গায়ের চামড়া নীল—সেই বাচ্চারা বাঁচেই না প্রায়।

টুম্পা বলল—কেন?

—আসলে ওদের হার্টে গঠনগত গোলমাল। ফলে হার্ট থেকে ফুসফুসে রক্ত ঠিকমত যায় না, রক্তেও অক্সিজেন মেশে কম। যেহেতু রক্তে অক্সিজেন কম, রক্তের রঙটা হয় একটু নীলচে, ঠোঁট বা অন্য পাতলা চামড়ার নীচে রঙটাও

দেখায় নীলচে। বাইরের দেশগুলোতে এখন অপারেশনও হয় খুব সূক্ষ্মভাবে, যন্ত্রপাতিরও এলাহি আয়োজন, ফলে ঐ রকম 'ব্লু-বেবি জন্মালে ডাক্তাররা বাচ্চার একদিন বয়সেও অপারেশন করে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে দেন।

টুম্পা বলল—আচ্ছা ছোটমামা, একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে। হার্ট পাম্প করছে, ফলে শরীরে রক্ত যাচ্ছে। কিন্তু হার্টেই যদি অপারেশন হয়, শরীরের অন্য অংশে রক্ত যাবে কি করে ?

ছোটমামা হাসলো।—আসলে হার্ট অপারেশনের সময় দুটো জিনিস ভীষণ দরকার। একটা হচ্ছে হার্ট-লাঙ-যন্ত্র, মানে যতটা সময় ধরে অপারেশন চলবে, রক্তটা হার্টের বদলে ঐ যন্ত্রটার মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে, যন্ত্রটাই সাময়িকভাবে সারা শরীরে রক্তটা পাম্প করে পাঠাতে থাকে। আর অন্য ব্যাপারটা হচ্ছে 'হাইপোথার্মিয়া'—অর্থাৎ, শরীরের তাপমাত্রা ঐ অপারেশনের সময় কৃত্রিমভাবে কমিয়ে ফেলা হয়, যাতে শরীরের কোষগুলো কাজ করে কম, অক্সিজেনের চাহিদাও থাকে কম।

সত্যবাবু বললেন—বিজ্ঞান কতোটা এগিয়েছে ভাবো একবার! খেয়াল আছে, কয়েক বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন এক সার্জেন একজনের শরীর থেকে গোটা হার্টটা তুলে অপরের শরীরে বসিয়ে দিয়েছিলেন ?

ডাক্তার ক্রিশ্চিয়ান বার্ণাড। ছোটমামা বললো—হার্ট অপারেশনের ক্ষেত্রে সেটা এক যুগান্তকারী ঘটনা বলতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে সবথেকে বড় সমস্যা হল, শরীরের মধ্যে বাইরের একটা জিনিস বসিয়ে দিলে শরীর তাকে শত্রু ভাবে, যতক্ষণ না তাকে বাতিল করতে পারে, ততক্ষণ শান্তি নেই। এই যে সমস্যা—বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে 'ইমিউনোলজিক্যাল বেরিয়ার' একে জয় করাটাই এখন বিজ্ঞানীদের চরম লক্ষ্য।

টুম্পা বললো—এই ফাঁকে একটা কথা বরং জেনে নি। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম মার্কিন মুলুকে না কি কোন রোগীর বুকে প্লাষ্টিকের হার্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ? এটা সম্ভব হল কি করে ?

ছোট্ট করে আলমোড়া ভাঙলো ছোটমামা—ইংরেজিতে একটা কথা আছে না 'নেসেসিটি ইজ্ দা মাদার অফ ইনভেনশন্ ?' 'ইমিউনোলজিক্যাল গণ্ডগোলে' বেশ কয়েকটা সফল অপারেশনের বারোটা বাজার পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন কৃত্রিম যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হবে, না হলে এই সমস্যা এড়ানো মুশকিল! তাই গত প্রায় পনেরো বছর ধরে চেষ্টা চলছে হার্টের টুকটাক মেরামতির কাজে পলিইউরেথেন প্লাষ্টিক ব্যবহারের চেষ্টা। এসেছে কৃত্রিম হার্ট-ভালভ্, এসেছে কৃত্রিম রক্তবহানালী। তবে গত তিরাশিতে সবাইকে টেক্কা দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।

সত্যবাবু বললেন—কি রকম ?

ডাক্তার উইলিয়াম কলফ্, ডাক্তার উইলিয়াম ডি-ভ্রিস আর রবার্ট জারভিক, একসাথে চেষ্টা চালিয়ে ৬১ বছর বয়সী দাঁতের ডাক্তার বার্ণে ক্লার্কের হার্টের নীচের ভাগটা, অর্থাৎ দুটো নিলয়ই বেমালুম পাল্টে দিলেন, বসিয়ে দিলেন পলিইউরেথন প্লাস্টিকের তৈরী কৃত্রিম হার্ট। অবশ্য ক্লার্ক-সাহেব বেশীদিন বাঁচেন নি—নিউমোনিয়া হয়ে মারা যান।

টুম্পা বললো—তুমি তো বেশ অবলীলাক্রমে বললে, নিলয় দুটো পাল্টে দিলো। গল্পের মত মনে হচ্ছে না ?

মুচকি হাসলো ছোটমামা।—বিলকুল সত্যি গল্প। তড়িঘড়ি করে অপারেশনের সময় এগিয়ে দিতে হয়েছিল আটঘণ্টা। তবেই সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলেন ক্লার্ক-সাহেব !

সত্যবাবু নড়েচড়ে বসলেন।—ইনটারেস্টিং ! ঘটনাটা কি ঘটেছিলো ?

—সব গল্পেরই একটা ভূমিকা থাকে, এ গল্পেরও আছে। ভূমিকাটা বলার ফাঁকে গাবলু বরং একটু চায়ের কথা বলে আয়। চশমার ফাঁক দিয়ে গাবলুর দিকে তাকালো ছোটমামা।

—কৃত্রিম হার্টের কারিগরী দিকটার পরিকল্পনা রবার্ট জারভিকের। ১৯৭১ সাল থেকেই তিনি এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন নানা জীবজন্তুর ওপর। পরীক্ষার ফলও মোটামুটি সন্তোষজনক, শুধু মানুষের ওপর ফলাফলটা পরীক্ষা করার অপেক্ষা।

সত্যবাবু বললেন—মানুষ তো আর খরগোস বা গিনিপিগ্ নয় যে পরীক্ষা করলেই হল ?

ঠিক তাই।—ছোটমামা বললোঃ অনেক পরীক্ষার পর ইউটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐ গবেষকদল 'ফুড এ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' সংস্থার কাছে ১৯৮১-তে অনুমতি চাইলেন যে তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের হার্টে পলি ইউরেথেনের তৈরী অংশ লাগাতে চান। অনেক টালবাহানার পরে তো অনুমতি মিলল—'৮২-র জুন মাসে। তবে সর্ত হল, এমন মানুষের ওপর এই কৃত্রিম হার্ট ব্যবহার করতে হবে যার জীবনের কোন আশা নেই, অন্য কোনভাবেই তাকে আর বাঁচান যাবে না।

—এমন রোগী তো পাওয়া মুশকিল ?

প্রায় তাই।—গাবলুর হাত থেকে চায়ের কাপটা টেনে নিল ছোটমামাঃ এর জন্য অপেক্ষা করতে হল বিরাশীর অক্টোবর পর্যন্ত। বার্নে ক্লার্ক বলে এক দাঁতের ডাক্তার, ৬০ বছর বয়স, নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন। তাঁর হার্টের মাসলে অজানা ভাইরাসের আক্রমণের ফলে 'টিস্যু' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কোন ওষুধে কাজ হচ্ছে না, কোন সার্জন-ও ঝুঁকি নিতে রাজী নন, অথচ অবস্থা এমনই যেকোন মুহূর্তে হার্টের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তিনি নিজে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁকে নিয়ে পরীক্ষা চালান হোক।

চোখ বড়বড় করে শুনছিলো টুম্পা। বললো—তারপর?

—তারপর আর কি? জানুয়ারী মাসে অপারেশনের দিন ঠিক হল। বড় অপারেশন, সাব্যস্ত হল সকাল আটটায় অপারেশন শুরু হবে। কিন্তু অপারেশনের ঠিক আগের দিন ঘটলো এক বিপত্তি।

কেন?—সত্যবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল ছোটমামার কথার প্রতিটি বর্ণই শুনেছেন তিনি।

চায়ের কাপে চুমুক দিলো ছোটমামা।—আগের দিন দুপুরে বার্ণে সাহেবের অবস্থা খুব খারাপের দিক মোড় নিল। তাঁর দেখাশুনা করছিলেন ডাক্তার ডি-ভ্রিস। ডি-ভ্রিস বুঝলেন অবস্থা সঙ্গীন, পরের দিন সকাল পর্যন্ত রোগী টিঁকবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন শুরু করতে হবে।

রুদ্ধশ্বাসে গাবলু বললো—সেদিনই অপারেশন হল?

ছোটমামা হাসলো।—ঝামেলা ত সেইখানেই। এসব অপারেশন তো আর মুখের কথা নয়, চাই বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া ডাক্তারের দল, নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি! কথা ছিল পরের দিন অপারেশন করবেন ডাক্তার ডি-ভ্রিস, তাঁর প্রধান সহকারী হিসেবে থাকবেন ডাক্তার লায়লি জয়েস। কিন্তু জয়েস সেই মুহূর্তে আর একটা জটিল হার্ট অপারেশনের কাজে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছেন, আগামী পাঁচ-ছ'ঘণ্টার মধ্যে তাকে পাওয়া যাবে না, এছাড়া যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে, একটা অপারেশনের পর সেগুলো বীজাণুমুক্ত করে পরের অপারেশনের জন্য তৈরী করতে আরো কয়েকঘণ্টা সময় লাগবে।

টুম্পা বললো—ভীষণ 'টেনশন্' ত?

—সে আর বলতে! যাই হোক, ডাক্তার জয়েস খালি হলেন রাত আটটা নাগাদ; আর বার্নেকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকান হল রাত সাড়ে দশটায়!

সত্যবাবু বললেন—ডাক্তার জয়েসের কথা ভাবো তো? পর পর দুটো ঐরকম অপারেশন? অপারেশন শেষ হল কখন?

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো ছোটমামা।

—সময় একটু লেগেছিলো বই কি! প্রাথমিক ব্যবস্থাপত্র শেষ করে বার্ণের পাঁজরা যখন খোলা হল, রাত বারটা বেজে গেছে। একটা দিনের শেষ—আর একটা দিনের শুরু। বার্ণের হার্টের অবস্থা এদিকে সঙ্গীন, নানা ওষুধবিষুধ খেয়ে হার্টের দেওয়াল পাতলা হয়ে গিয়েছে, তারই মধ্যে নিলয়

দুটো কেটে ফেলে কৃত্রিম নিলয় বসাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হচ্ছে রক্তচাপ, ফুসফুসের শক্তি, ব্রেনের অবস্থা। কৃত্রিম হার্টের সংকোচন-প্রসারণের জন্য দরকার বাইরের থেকে যুক্ত 'এয়ার-কম্প্রেসর যন্ত্র। ঝামেলাটা বুঝুন তো?

—কতক্ষণে শেষ হল?

হাতটা মাথার পেছনে দিয়ে পিঠটা টানটান করলো ছোটমামা।

—বার্নেকে যখন অপারেশন টেবিল থেকে তার ঘরে নিয়ে আসা হল, ঘড়িতে সকাল সাতটা বেজে গেছে!

সত্যবাবু বললেন—বার্ণে সুস্থ হয়ে উঠলেন কবে?

—তা প্রায় মাসখানেক সময় লেগেছিল। অবশ্য আরও দুবার বার্ণের ওপর ছোটখাট অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল টুকটাক নানা উপসর্গের জন্য। অবশ্য উনি তারপর বেশীদিন বাঁচেন নি—নিউমোনিয়ায় ভুগে মারা যান।

টুম্পা বললো—বার্ণে সাহেব তো আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন নি? হার্টের সঙ্গে 'এয়ার-কম্প্রেসর' লাগান থাকলে কি আর কেউ নিজের খুশি মত হাঁটাচলা করতে পারে?

ঘাড় নাড়লো ছোটমামা।

—বার্ণে তা না পারলেও এটা ত বোঝা গেল, কৃত্রিম হার্টও মানুষের শরীরে বসানো যায়? তাছাড়া ইঞ্জিনিয়াররা আশা করছেন, তাঁরা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যাটারীচালিত ক্ষুদে 'কম্প্রেসর' বানিয়ে ফেলতে পারবেন। সেটাকে স্কুলব্যাগের মত পিঠে বেঁধে বা ব্রীফ কেসের মত হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া যাবে। ভাবতে অবাক লাগে না?

সত্যবাবু বললেন—বার্ণে সাহেব সাহস করে এগিয়ে এসেছিলেন বলেই তো ঐ ব্যাপারটা সম্ভব হলো? আর তেমনি সাহস ডি-ভ্রিসের!

মুচকি হেসে ছোটমামা বললো—ডি-ভ্রিসের আগেই একজন ডাক্তার এই দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন! ডাক্তারের নাম ডেন্টন-কুলি। এ যুগের বিখ্যাত হার্ট-সার্জেন, 'বাইপাস-হার্ট সার্জারী' মানে অসুস্থ করোনারীর ধমনীর বিকল্প রাস্তা তৈরী করে হার্টকে বাঁচানোর অপারেশন করে যিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন!

সত্যবাবু বললেন—এ আবার কি রকম ধাঁধা?

ফুড এ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অনুমতি দেবার আগেই ডাক্তার কুলি, মেফেলস্ নামে এক ছত্রিশ বছর বয়সী ওলন্দাজ বাস ড্রাইভারের বুকে কৃত্রিম হার্ট বসিয়েছিলেন।

তা কি করে হলো?—টুম্পার জিজ্ঞাসা।

—মেফেলসের হার্টে অন্য একটা অপারেশন চলার সময় তার 'হার্ট-ফেলিওর' হয়। কুলি দেখলেন মাত্র ছত্রিশ বছর বয়েস, একে এভাবে মরতে

দেওয়া ঠিক হবে না। এর হার্ট পাল্টিয়ে অন্য লোকের হার্ট বসাবেন। অবশ্য চাই বললেই তো পাওয়া যায় না, নতুন হার্ট পেতে সময় লাগলো আরো দুটো দিন। ইতিমধ্যে মেফেলস্‌কে বাঁচানোর জন্য মাঝের দুদিন তার বুকে কৃত্রিম হার্ট বসিয়ে রাখেন ডেন্টন কুলি।

সত্যবাবু বললেন—এর জন্য ঝামেলা হয় নি?

ছোটমামা হাসলো।—ডেণ্টল কুলি বলেই বিশেষ ঝামেলা হয় নি। তবে উনি বুদ্ধি করে এটা করেছিলেন বলে সে যাত্রা মেফেলস্‌ বেঁচেছিলো; তবে অন্য লোকের হার্ট বুকে নিয়ে সে অবশ্য বেশীদিন বাঁচে নি।

টুম্পা বললো—এখানেও সেই 'ইমিউনোলজিক্যাল বেরিয়ার'?

ছোটমামা বললো—তাই। তবে এ নিয়ে এখন বিস্তর কাজকর্ম চলছে। প্রথম হার্ট বদলের রোগী আঠারো দিন বাঁচলেও এখন অনেকেই আট দশ বছর দিব্যি বেঁচে থাকছেন।

হার্ট বদলে বসানো হয়েছিল প্রথম কবে?—সত্যবাবুর প্রশ্ন।

একটু ভেবে নিয়ে ছোটমামা বললো—ছেষট্টি....না, সাতষট্টির ডিসেম্বরে। তেসরা ডিসেম্বর। অপারেশন করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান বার্ণাডি। পথ-দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া পঁচিশ বছর বয়সী একটি মেয়ের হার্ট তুলে তা তিনি বসিয়ে দেন আঠান্ন বছরের এক ভদ্রলোকের বুকে।

টুম্পা বললো—ছেলেদের শরীরে মেয়েদের হার্ট? স্বভাব বা আচরণের কোনো পরিবর্তন হয় নি?

দূর বোকা। তা হয় নাকি? ছেলেদের মানসিকতা আর মেয়েদের মানসিকতার তফাৎ, মূলত নির্ভর করে কিছু 'হরমোনের' তারতম্য আর মস্তিষ্কের গঠনের ওপর। তাছাড়া—ছোটমামা হেসে ফেললো—সে রোগীর ওপর পরীক্ষা চালানোও সম্ভব হয় নি। বেঁচেছিল আর মাত্র আঠারো দিন।

এই অপারেশনটা করেই তো বিখ্যাত হয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ান বার্ণাডি?—ভুলে যাওয়া প্রায় ঠান্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সত্যবাবু।

—না। আসলে ডাক্তার বার্ণাডের প্রথম সফল রোগী ফিলিপ ব্লেইবার্গ। ব্লেইবার্গ ছিলেন বার্ণাডের দ্বিতীয় রোগী। ব্লেইবার্গ বেঁচেছিলেন অপারেশনের পরে আঠারো মাস। ক্রমে ডাক্তারেরা এই অপারেশনে আরও সফল হলেন, নতুন হার্ট বুকে নিয়ে রোগীরা বাঁচতে লাগলেন দু বছর, পাঁচবছর সাতবছর। এই ১৯৮৪ তেও এমন দু'জন রোগী বেঁচে আছেন যাঁরা একযুগেরও বেশী সময় ধরে অন্যের হার্ট বুকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

সত্যবাবু বললেন—বলো কি? এ তথ্যটা তো জানা ছিলো না?

একজনের নাম ইম্যানুয়েল ভিট্রিয়া, জাতে ফরাসী, থাকেন মার্সিলিস-এ।

ছোটমামা আর একটু বিস্তারিত হলো ঃ চৌষট্টি বছরের এই যুবকটি বেশ স্ফূর্তিবাজ, গত প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে অন্যের হার্টের দখল নিয়ে বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছেন। এমনিতে অবশ্য ভদ্রলোক বসে থাকার পাত্র নন। নিজে গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়ান, বাজার করেন, নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম নিয়ে মেতে আছেন। দিনে অবশ্য বিশ ত্রিশটা ট্যাবলেট খেতে হয়। আর একজনের নাম ভ্যান বুরেন, বয়স তিপান্ন, থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। গত বারো বছর ধরে অন্যের হার্ট বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন।

সত্যবাবু বললেন—অবশ্য কৃত্রিম হার্টের থেকে এ ভালো। যদিও দিনে তিরিশটা ট্যাবলেট খেতে হয়, তবু তো নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা যায় ?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছোটমামা বললো—হ্যাঁ, আজকাল তো 'ইমিউনোলজিক্যাল' বাধাকে জয় করার জন্য গবেষণা চলছে বিস্তর। বেরিয়েছে 'সাইক্লোস্পোরিন' ধরনের নানা রাসায়নিক, কি না রক্তে মিলিয়ে দিলে শরীরের রোগ প্রতিরোগ ব্যবস্থা, অন্যের শরীর থেকে নিয়ে বসানো 'টিস্যুকে' শত্রু বলে আর ভাবে না। অবশ্য এসব ওষুধের 'সাইড-এফেক্ট' আছে বিস্তর। তাদের ঠেকাতে খেতে হয় অন্য নানা ওষুধ—খাওয়া দাওয়ার নানা বাধানিষেধ। আজ চলিরে। উঠে দাঁড়ালো ছোটমামা।

সত্যবাবু বললেন—কথার ফাঁকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। খাওয়াদাওয়ার কথাতে মনে পড়ে গেল।

কি কথা ?—দরজার গোড়ায় থমকে দাঁড়লো ছোটমামা।

—সামনের শনিবার গাবলুর জন্মদিন। টেলিফোনে তোমাকে জানানোর দায়িত্ব ছিলো আমার। ভুলে যেও না।

ঠিক আছে। ঠিক আছে।—পা বাড়ালো ছোটমামা।

গাবলু-টুম্পা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—ভুলোনা কিন্তু!



লোভে পাপ পাপে মৃত্যু !

তোমার কোন কথার ঠিক নেই।

—ছোটমামা ঘরে ঢুকতেই ঘড়ির দিকে তাকালেন সত্যবাবু ঃ তোমায় সেদিন বার বার করে বললাম গাবলুর জন্মদিনে কোথায় বিকেল বিকেল চলে আসবে, তা না তুমি ঢুকলেই রাত ন'টা বাজিয়ে।

বকুনি পরে দেবেন। এদিকে প্রাণহরা রান্নার গন্ধ, সঙ্গে পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। খেতে বসে গল্পটা জমে ভাল।—সদলবলে খাবার টেবিলে চলে এলো ছোটমামা।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গাবলু টুম্পার মা। বললেন—তোমরা চারজনেই বসে পড়ো, আমি দিতে থাকি।

কি কি আইটেম হয়েছে বলতো টুম্পা?—হাত ধুতে ধুতে ছোটমামার প্রশ্ন!

—ধৈর্য্য ধরো। মেনু ক্রমশঃ প্রকাশ্য। খাই খাই করো কেন, এস বস আহারে খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।

তোদের দৌড় সুকুমার রায়ের খাইখাই-এর ঐ প্রথম চার ছ' লাইন।—টেবিলে বসে পড়লো ছোটমামা।

—কেন?

—আমাদের খাওয়া মানেই তো ডাল-ভাত-মাছ-মাংস দই-মিষ্টি। সুকুমার রায়ের ভাষায় 'ময়রা ও পাচকের যতো সব সৃষ্টি'!

সত্যবাবু বললেন—সেগুলো কি তোমার পছন্দ নয়?

মাথা চুলকোলো ছোটমামা।—পছন্দ নয়, সে কথা একবারও বলি নি। আমি বলতে চাইছি সুকুমার রায় অনেক ভালো ভালো খাবারের কথা বলেছেন ঐ ছড়াতে। যেমন ধরুন একটা লাইন, ব্যাঙ খায় ফরাসীরা, খেতে নয় মন্দ....

ভাতের থালা নামাতে নামাতে গাবলু-টুম্পার মা বললেন—উঁহুঁ, খাবার সময় আজেবাজে কথা একদম নয়।

ভাত ভাঙতে ভাঙতে ছোটমামা বললো—একদম নয়। তবে ঐ বস্তুটি পাঁঠা বা মুরগীর থেকে অনেক ভালো। ফ্যাট ভীষণ কম। হার্টের রোগীদের পক্ষে তো খুব ভালো।

ব্যস। অনেক হয়েছে।

—ছোট্ট করে ধমক দিলেন গাবলু-টুম্পার মা: কী দিয়ে ইলিশমাছ ভাজা খাবে বলো? ঘি না মাছের তেল?

গাবলু-টুম্পা একসঙ্গে বললো—ইলিশ মাছের তেল।

আমায় বরং একটু ঘি দিও।—ভাতের থালায় হাত দিলেন সত্যবাবু।

ছোটমামা বললো—সবাইকেই বরং মাছের তেল দাও। মাছের তেল দিয়ে ভাত মেখে খাওয়া, তার স্বাদই আলাদা।

সত্যবাবু বললেন—ঘি তাহলে কি দোষ করলো?

সরাসরি ভাতের গ্রাস মুখে চালান করলো ছোটমামা।—বিপদ আছে।

কি রকম?—ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েও থমকালেন সত্যবাবু।

—তেল বা ঘি'র প্রধান উপাদান হলো ফ্যাটি অ্যাসিড। এখন এই ফ্যাটি-অ্যাসিড সংপৃক্ত বা অসংপৃক্ত দু-ধরনের হতে পারে। যে স্নেহ পদার্থে সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বেশী, তারা রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়।

এতদিনে বুঝলাম কেন বলা হয় স্নেহ অতি বিষম বস্তু।—পাশ থেকে মন্তব্য করে টুম্পা।

হেসে ফেললো ছোটমামা।—স্নেহমাত্রেই বিষম বস্তু নয়। কিছু কিছু বিশেষধরনের অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যারা রক্তে কোলেস্টেরল কমায়।

সত্যবাবু বললেন—যাক্, একটা ভালো খবর শোনালে। রক্তের কোলেস্টেরল তা হলে কমানো যায়? ঐ সব কেমিষ্ট্রির কচকচানি না করে বলো তো কি তেল খেলে কোলেস্টেরল কমবে।

ইলিশমাছের কাঁটা বাছতে বাছতে ছোটমামা বললো—সেই জন্যেই তো মাছের তেল খেতে বললাম। এ ছাড়া সূর্যমুখী তেল আছে, তিল তেল আছে।

পাশ থেকে গাবলু-টুম্পার মা বললেন—রান্নার তেল হিসেবে সরষের তেল কি খারাপ?

ছোটমামা বাটি থেকে ডাল ঢালতে ঢালতে বললো—অর্থাৎ যা দিয়ে এই বেগুনভাজা হয়েছে?

সত্যবাবু বললেন—খাঁটি ঘানির তেল!

—বিশেষ লাভ নেই। সরষের তেল কোলেস্টেরল কমায় না, বাড়ায়ও না। বাদাম তেলও তাই। অবশ্য সরষের তেলের একটা উপাদান' 'ইরিউসিক অ্যাসিড' নাকি হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কথা অনেক বিজ্ঞানীই বলেছেন।

হতাশ হয়ে সত্যবাবু বললেন—তাহলে কি শুধু সেদ্ধ খেয়ে থাকবো ?

—বাদাম তেল খারাপ না। কোলেস্টেরল কমা-বাড়ার ওপর এর বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। তবে সাবধান থাকা উচিত ঘি, বনস্পতি, নারকেল তেল, মাখন—এগুলো থেকে, বিশেষতঃ বয়স যদি পঁয়ত্রিশের বেশী হয়।

সত্যবাবু বললেন—তোমার কথা শুনে ফ্রায়েড রাইসটাই বিস্বাদ লাগছে যে ? সকালবেলা একটু মাখন, আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে অফিস যাই—তাতেও তুমি বাদ সাধছো ?

খানিকটা যেন চমকে গিয়ে বাটি থেকে দু-পিস মাছ তুলে নিলো ছোটমামা।

—করছেন কী ? মাখন ডিমসেদ্ধ সব একসাথে ?

—কেন ? ডিম আবার কি দোষ করলো ?

—আপনি কি জানেন, প্রতি ১০০ গ্রাম ডিমের কুসুমে দেড়-গ্রাম কোলেস্টেরল থাকে ? আমাদের চেনা খাবারের মধ্যে সবথেকে বেশী কোলেস্টেরলের যোগানদার !

গাবলু বললো—এই কারণে আমি ডিম খেতে চাই না।

ভাতের থালা থেকে মুখ না তুলেই টুম্পা বললো—তোমার পছন্দসই চকোলেট, আইসক্রীমেও কোলেস্টেরল নেহাত কম না !

সত্যবাবু বললেন—তাহলে আলুসেদ্ধ মাখন ভাত চলবে না ?

ছোটমামা বললো—হাই প্রেশার থাকলে না। আসলে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ধরনধারণ একটু উল্টোপাল্টা। সেদ্ধভাত খায়—কিন্তু ভাতের ফেনটা ক'জন ভাতে মাখে বলুন দেখি ?

পাশ থেকে গাবলু বললো—মানুষ কি গরু নাকি ? 'ফেন' তো গরুতে খায় !

ঐ তো মুশকিল। ফেনের সঙ্গে ভাতের পুষ্টির একটা বড় অংশ আমরা ফেলে দিচ্ছি সেটা কি জানিস ?

টুম্পা বললো—স্টার্চ ?

—স্টার্চ ছাড়াও এর সঙ্গে 'বি-গ্রুপের' কিছু ভিটামিন চলে যাচ্ছে যারা হার্টের পেশীকে সতেজ করে।

টুম্পা বললো—বি-গ্রুপের ভিটামিনের সঙ্গে হার্টের সম্পর্ক আছে তাতো জানতাম না ?

—শুধু 'বি' ভিটামিনই নয়, হার্টের পক্ষে 'ভিটামিন-ই' ও ভালো। এতে নাকি কোলেস্টেরল কমে। ভিটামিন-সি সম্পর্কেও এই একই কথা। রোজ নিয়ম করে তরকারী, ফল খাও, ভিটামিনের অভাব হবে না।

মাংসের একটা টুকরো মুখে দিয়ে সত্যবাবু বললেন—নুন কম লাগছে। একটু নুন দাও তো ?

গাবলু-টুম্পার মা বললেন—তোমার না পাতে নুন খাওয়া বারণ ?

এই এক হয়েছে। সত্যবাবু বিরক্তভাবে বললেনঃ খাবার পাতে নুন নিয়ে তোমাদের এত আপত্তি কেন তা বুঝি না।

ছোটমামা বললো—কিঞ্চিৎ কঠিন প্রশ্ন সন্দেহ নেই। তবে দু-এক কথায় ব্যাপারটা বরং বলার চেষ্টা করি।

টুম্পা বললো—মাংসের বাটিটা ইতিমধ্যে খালি করো। তোমার দেখছি মাংস খাবার ব্যাপারে উৎসাহ কমে গেছে।

ছোটমামা বললো—পাঁঠার মাংস, ফ্যাট কিঞ্চিৎ বেশী। সুতরাং বেশী খেতে ভরসা পাচ্ছি না। এ প্রসঙ্গে কথা বললে নুনের প্রসঙ্গটা ভুলে যাবো। সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করি বরং। এটা আমরা জানি যে মোটামুটি লিটার পাঁচেক রক্ত আমাদের শরীরে আছে। এটাই একটা স্বাভাবিক হার্টের ওপর স্বাভাবিক কাজের বোঝা।

গাবলু বললো—তার মানে ?

—ধর্, একজন টাইপিস্ট, সারাদিনে ত্রিশ পাতা টাইপ করে। এটা তার স্বাভাবিক কাজ। তাকে যদি একদিন বলা হয় পঞ্চাশ পাতা টাইপ করো, সেটা তার পক্ষে বাড়তি কাজ হবে তো ? হার্টের বেলায়ও তাই। রক্তে নুন বেশী থাকলে নুন জল টানবে—ফলে রক্তের জলীয় ভাগটা পরিমাণে বেড়ে যাবে। এটা হার্টের পক্ষে বাড়তি কাজ হলো। স্বাভাবিক হার্ট এটুকু বাড়তি কাজ সামলে নেয়—বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু গণ্ডগোল হবে যদি হার্টটা বড়ো হয়ে থাকে বা রক্তের চাপ বেশী থাকে।

সত্যবাবু বললেন—কেন ?

—হার্ট যখন বড় হয়ে যায়, তখন তার পেশীগুলোর কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। সেই অবস্থায় অনেক সময় কিডনীও আর কাজ ঠিকমতো করে না, শরীর থেকে বাড়তি নুন সে বার করতে পারে না। ফলে এমনিতেই রক্তে নুনের পরিমাণ বেশী থাকে, এর ওপর খাবারে নুন খেলে সেই বাড়তি নুন এসে জমবে রক্তে।

সত্যবাবু বললেন—গোদের ওপর বিষফোড়া !

এর ফল গিয়ে দাঁড়াবে কোথায় ?—টুম্পার প্রশ্ন।

—নুনের অণুরা তো আর শুধু রক্তেই থাকবে না, রক্তনালী পেরিয়ে তারা জমা হবে রক্তনালীর বাইরের এলাকায়, যাকে বলে 'টিস্যু-ফ্লুইডে'। নুন থাকলে জলও থাকবে—বাড়তি জলটা নানা কোষের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জমবে রক্তরসে, 'টিস্যু-ফ্লুইডে'। ক্রমে দেখা যাবে পা-ফুলছে, হাত-ফুলছে, মুখ ফুলছে—এর সঙ্গে প্রেশার বাড়া এবং নানা উপসর্গ।

সত্যবাবু বললেন—আগেকার দিনে তো হাত-পা-মুখ ফুললে ডাক্তার কবিরাজরা বলতো লক্ষণ ভাল না, শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ছোটমামা বললো—আজকাল অবশ্য দিন পাল্টিয়েছে। নানা ওষুধপত্র বেরিয়েছে, যা দিয়ে অবস্থা সামলে দেওয়া যায়। 'ল্যাসিক্স'-গোছের নানা ওষুধ আছে যেগুলো শরীর থেকে জল বার করে দেয় বেশী পরিমাণে। জল বেরিয়ে গেলে সাথে-সাথে নুনও বেরিয়ে যায় খানিকটা। এছাড়া সে অবস্থায় খাবারে নুন বন্ধ করে দেওয়া হয় একদম। ফলে রক্ত এবং 'টিস্যু-ফ্লুইডে' নুনের মাত্রা কমে আসে, জল-জমা কমে—কমে হার্টের ওপর কাজের চাপ!

সত্যবাবু বললেন—কাল থেকে রান্নায় নুন একদম বন্ধ।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন গাবলু-টুম্পার মা। বললেন—তুমি থামো তো। নুন না দিলে খাবার মুখে তুলবে কেমন করে?

না, না। একদম বন্ধ করার দরকার নেই।—হাত নাড়লো ছোটমামা : আমি আগেই বলেছি যাদের হার্টের কোনো গোলমাল নেই, তারা স্বাভাবিক পরিমাণেই নুন খাবে। তাছাড়া আমাদের দেশ গরমের দেশ। ঘামের সঙ্গে প্রচুর নুন শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। একটু নুন না খেলে চলবে কেন? তবে পাতে নুন খাবার অভ্যেস যতো না থাকে ততোই ভাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সত্যবাবু।—তাহলে বোঝাই যাচ্ছে বেশী তেল-ঘি, নুন, এ সবই বর্জন করতে হবে। এবার বলো দেখি খাব কি? স্রেফ দই আর মিষ্টি?

মাংসের বাটি শেষ করে দই-এর প্লেটের দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা।

—দই খান। প্রচুর পরিমাণে খান। কিন্তু মিষ্টি নয়। চল্লিশ বছরের পর থেকে সন্দেশ রসগোল্লা যত কম খাওয়া যায়, ততই মঙ্গল, বিশেষ করে চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তদের পক্ষে তো বটেই।

টুম্পা বললো—কেন? দই আর মিষ্টি তো লোকে একসঙ্গেই খায়। এর মধ্যে দই হয়ে গেল ভালো আর মিষ্টি খারাপ? এ আবার কেমন যুক্তি?

নিঃশব্দে আধপ্লেট দই শেষ করলো ছোটমামা।—দইয়ের গুণ অনেক। বুলগেরিয়ার লোকেরা রোজ কমপক্ষে একপোয়া দই খায় তা জানিস? এতে রক্তে কোলেস্টেরল কমে।

সত্যবাবু বললেন—তুমি নিজে দই খেতে ভালোবাসো, তাই তোমার এই সব যুক্তি। দাও, ওকে আর একটু দই দাও।

ছোটমামা হাসলো।—দই মানে বাড়ীতে পাতা টক দই। হাল আমলে মার্কিন বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যাঁদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশী, তাঁরা যদি নিয়মিত দই খাওয়া অভ্যেস করেন, তাহলে কোলেস্টেরল কমে চট্‌পট। অবশ্য তার সঙ্গে তেল বা চিনি জাতীয় খাবার ছাড়তে হবে।

কিন্তু দই আর কোলেস্টেরলের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় ?—চাটনী শেষ করে দই এর প্লেটের দিকে হাত বাড়ালো টুম্পা।

—দই-এ 'মিথিওনিন' বলে একধরনের 'অ্যামিনো-অ্যাসিড' থাকে যা কি না লিভারে বাড়তি ফ্যাট জমতে দেয় না। তাছাড়া অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন দই-এ 'ওরোটিক অ্যাসিড' বলে বিশেষ একধরনের 'ফ্যাটি অ্যাসিড' থাকে যা শরীরে কোলেস্টেরল তৈরী হতে বাধা দেয়, বিশেষতঃ লিভার আর অন্ত্রের দেওয়ালে। ফলে, যাঁরা নিয়মিত দই খান, তাঁদের রক্তনালীর গায়ে কোলেস্টেরল জমে পরিমাণে কম, হার্টের ওপর বাড়তি চাপও যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমে।

মিষ্টির প্লেট-টা সরিয়ে রাখতে রাখতে ছোটমামা বললো—না, মিষ্টি একদম না। রোগা পাতলা লোকেদের পক্ষে হয়তো এটা ভালো, কিন্তু মোটা মানুষদের পক্ষে একদম না।

টুম্পা বললো—বারে, জন্মদিনের খাওয়াদাওয়া, তাতে মিষ্টি থাকবে না ? একটা অন্ততঃ খাও। তাছাড়া শরীরে শক্তি যোগায় গ্লুকোজ, সেটাও তো চিনিই ?

হতাশভাবে ছোটমামা বললো—ঐখানেই তো মুশকিল। বাড়তি শক্তি পাওয়া যাবে বলে লোকে এন্তার মিষ্টি খাচ্ছে। কিন্তু এতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি শরীরে জমা হচ্ছে। শারীরিক পরিশ্রম যদি কম হয়, চিনির বাড়তি অংশ ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়ে তৈরী করবে চর্বি। অনেককে দেখবেন 'ডায়েটিং' করছে অথচ টুকটাক মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছে। ফলে ভুঁড়ি আর কমে না।

সত্যবাবু বললেন—দামী কথা বলছো। বেশী চিনি খেলে ফ্যাট হয়, একথা আমরা ক'জন জানি ?

খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো ছোটমামা।—হার্টের অসুখই বলুন বা অন্য নানা অসুখই বলুন, গণ্ডগোলের সূত্রপাত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই খাওয়াদাওয়া থেকেই। এমন কি এই যে জল—ক্ষেত্রবিশেষে তাও হার্টের অসুখের কারণ হতে পারে।

টুম্পা বলে উঠলো—ধ্যাৎ! তা-ও আবার হতে পারে না কি ?

হাত ধুতে উঠে পড়লো ছোটমামা।—কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডে একটা সমীক্ষা হয়েছিল—দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে হার্টের অসুখের দৌরাত্ম্য বেশী। দেখা গেল যেখানে জল খর, সেখানকার মানুষজনের মধ্যে হার্টের অসুখ কম। ঠিক উল্টো ব্যাপার মৃদু জলের ক্ষেত্রে।

ঠোঁট ওল্টালো টুম্পা।—সবই উল্টো কারবার! খরজলে কাপড় পরিষ্কার হয় না, আরো কতো অসুবিধে। সবাই তো মৃদুজল খোঁজে!

ছোটমামা বললো—হ্যাঁ, মৃদুজলে নানারকম লবণ গুলে যায়। যদি জলে ভারী ধাতুর লবণের ভাগ বেশী থাকে, তাহলে কিন্তু হার্টের অসুখের প্রবণতা বাড়ে।

সমীক্ষায় এ তথ্য জানার ফলে কোন উপকার হয়েছিলো?—সত্যবাবুর জিজ্ঞাসা।

নিশ্চয়।—তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ছোটমামা বললো ঃ সরকারী-ভাবে তখন উদ্যোগ নিয়ে জলে ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম মেশানো হয়েছিলো। জলটা খর হলো বটে, কিন্তু হার্টের অসুখ প্রতিরোধের ব্যবস্থা তো হলো? অবশ্য বাড়তি লাভ ও হলো একটা।

কি রকম?—বেসিনের ধার থেকে জিজ্ঞাসা করলো টুম্পা।

—ম্যাগনেসিয়াম রক্তে একটু বেশী থাকা ভালো। রক্তে যদি ম্যাগনেসিয়াম কম থাকে, তাহলে রক্তনালীর দেওয়ালে টান বাড়ে, তারা সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। এমন কি অনেক রোগী যাদের করনারী ধমনী সংকুচিত হয়ে 'ইসকিমিয়া' বা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাদের অনেকেরই রক্তে ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কম দেখা গেছে।

সত্যবাবু বললেন—বাইরের দেশ বলেই এমন ঘটনা সম্ভব হয়। এতো খুঁটিনাটি জিনিস সে দেশের বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এসব কতটুকু খোঁজ রাখে বলো দেখি?

ছোটমামা বললো—যেহেতু হার্টটা নিজের, খেয়াল রাখতে হবে নিজেদেরই। খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, টুকটাক অনেক এমন ব্যাপার আছে, যেগুলো সম্বন্ধে একটু সচেতন হলে হার্ট-সংক্রান্ত বিপত্তি ঘটার আশংকা অনেকটাই কমে যায়।

টুম্পা বললো—সেগুলো একটু বলো না।

ছোটমামা হাসলো।—আজ গাবলুর জন্মদিন, সুতরাং একটা উপহার ওর এমনিই পাওনা আছে। বাড়তি লাভ হিসেবে তোমরা কোলেস্টেরল কমানোর রহস্যটা জেনে নিতে চাও? তা বেশ!



চোরা না শোনে !

ঘরে ঢুকেই লাফিয়ে উঠলো গাবলু।

—আরে ব্বাস! এটা কি এনেছো?

ছোট্ট করে গাবলুকে ভ্যাংচালো টুম্পা।—দেখিস্ বাবা, আনন্দে না হার্টফেল করে। গত দুমাস ধরে বাবাকে তো রোজ বলছিলি—

শেষ পর্যন্ত তোমার হাত দিয়েই জিনিসটা এলো বাড়ীতে...! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সত্যবাবু: এমনিতে গাবলুবাবু কোনদিনও সন্ধ্যে ছ'টার আগে বাড়ী ফেরেন না। এবার ঐ ফুটবলটা পেয়ে আরো দেরি করবেন!

আহা, খেলুক না। খেলারই তো জিনিস। যত উঁচু ক্লাসে উঠবে, পড়ার চাপে খেলাধুলোয় এমনিতেই ঢিলে পড়ে যাবে।—সত্যবাবুকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে ছোটমামা: তাছাড়া দৌড়োদৌড়ি করলে হার্টেরও তো একটু ট্রেনিং হয়।

ধ্যাৎ, হার্টের আবার ট্রেনিং কি?—টুম্পার মুখে স্পষ্ট অবিশ্বাসের ছাপ।

—ট্রেনিং মানে হার্টকে শেখানো হচ্ছে কি করে আরো বেশী বিশ্রাম নেওয়া যায়।

ফুটবলটায় হাত বোলাতে বোলাতে গাবলু বললো—কিচ্ছু বুঝলাম না।

—আসলে হার্টের মাসল্গুলো প্রতিবারই যদি খুব জোরে পাম্প করে, তাহলে প্রত্যেকবারই হার্ট থেকে বেশী রক্ত ছড়িয়ে যাবে সারা শরীরে। তাই তো? এবার তোরাই বল্, রোজ যদি কেউ খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ করে, তার ফলে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে কি না?

টুম্পা বললো—কেন?

—কথায় বলে না 'চাপ দিয়ে কাজ আদায় করানো?' এখানেও ঠিক তাই ঘটে। দৌড়ঝাঁপ করলে শরীরের পেশীগুলোতে খাবার আর অক্সিজেনের চাহিদা বাড়বে। বাধ্য হয়েই হার্টকে আরো কাজ করতে হবে, না হলে ঐ চাহিদা মেটাবে কে? এখন নিয়মিতভাবে হার্টের ঘাড়ে যদি এই বাড়তি বোঝা চাপে,

হার্টকেও চেষ্টা করতে হয় কিভাবে সহজ কাজটা করবে! প্রথম প্রথম মিনিটে সত্তরের জায়গায় নব্বইবার পাম্প করতে হচ্ছিল মিনিটে, কিন্তু যেই ট্রেনিং হলো হার্টও তার পাম্প করার জোরটা বাড়িয়ে দিলো। সেক্ষেত্রে মিনিটে সত্তরবারের জায়গায় পঞ্চান্ন-ষাটবার পাম্প চালু রাখলেই যথেষ্ট নয়? তাহলে হার্ট আরো বেশী বিশ্রাম পাচ্ছে তো?

গাবলু বললো—ঠিকই তো! আমার বন্ধু অন্তু, ওর হার্টবিট মিনিটে বাহান্নবার। প্রতিবার দৌড়ে ফার্ষ্ট হয়!

ছোটমামা বললো—প্রাকটিস করলে তোরও হবে। বাইরের দেশের মানুষজন এখন হার্টের অসুখ থেকে বাঁচতে নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করছে।

এতে কি কোলেষ্টেরল কমে?—সত্যবাবুর প্রশ্ন!

—আলবাত্ কমে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যাঁরা নিয়মিতভাবে দৌড়োন বা হাঁটেন, তাঁদের রক্তে কোলেষ্টেরলের মাত্রা চট্ করে বাড়তে পারে না। অবশ্য এর সঙ্গে বেশী পরিমানে তেল ঘি মাখন মিষ্টি—এগুলোও অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিয়মিত ভোরবেলা পার্কে দৌড়োলেই হতো। —আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন সত্যবাবু।

—হাফ প্যাণ্ট পরে সকালে দৌড়োনোর দরকার নেই। অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় একটু হাঁটুন না। আস্তে নয়, জোরে জোরে। এখানে কয়েকটা নিয়ম আছে, বলে দি।

খেলাধুলোই হোক আর হাঁটাই হোক, আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হতে হবে। গা-জোয়ারি করে একসঙ্গে অনেকটা দৌড়োলাম—এর ফল খারাপ হতে পারে। মাঝে মাঝে 'পালস্-রেট' দেখে নেওয়া ভাল। 'পালস' ১২৫ ছাড়লে বুঝতে হবে পরিশ্রম বেশী হয়ে যাচ্ছে। আবার এমন আস্তে হাঁটলেও চলবে না যাতে পালস্ রেট ৯৫ বা ১০০-র নীচে নামে।

এতদিনে বুঝলাম।—গাবলু বলে উঠলো ঃ সকালবেলা পার্কে চক্কোর দিতে দিতে সামনের বাড়ীর সুনীলকাকু তাই মাঝে মাঝে পালস্ দেখে।

ছোটমামা বললো—ঠিকই। উনি স্বাস্থ্য সচেতন, তাই এটা করেন। কে কতটা হাঁটবেন তা নির্ভর করবে বাকি সারাদিন খাটাখাটনির মাত্রার ওপর। কম শারীরিক পরিশ্রম—বেশী দৌড়, বেশী কাজ—কম দৌড়! এর সঙ্গে নজর রাখতে হবে খাবারের সঙ্গে কি পরিমান 'ক্যালরি বা শক্তি শরীরে যাচ্ছে।

টুম্পা বললো—সে হিসেবটা পাবো কি করে?

—মোটামুটি হিসেব হলো, বাচ্চা আর কম বয়সীদের দরকার দিনে দু'

থেকে আড়াই হাজার 'ক্যালরি', সাধারণ মানুষ জনের দরকার দেড় হাজার থেকে দু' হাজার 'ক্যালরি', আর যাঁরা মোটা, তাঁরা দেড় হাজারের বেশী উঠবেন না।

ওসব হাজার দুহাজার বুঝি না। সহজ হিসেব বলো।—সত্যবাবুর মন্তব্য !

মাথা চুলকোলো ছোটমামা।

—ধরুন, এককাপ পরিমান চাল, আটা, মুড়ি, খই, ডাল বা ঐ ধরণের শ্বেতসার জাতীয় খাবারে পাওয়া যায় সাড়ে তিনশো 'ক্যালরি' মতো শক্তি। দুধ, ছানা, মাছ-মাংস, বাদাম, সয়াবিন—এই সব প্রোটিন জাতীয় খাবারে ক্যালরির পরিমানও মোটামুটি একই—একশ গ্রামে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো 'ক্যালরি'। তেল-ঘি জাতীয় খাবারে 'ক্যালরি'র পরিমান অনেক বেশী—একশ গ্রামে প্রায় আট-ন'শো ক্যালরি।

টুম্পা বললো—যারা এমনিতে মোটা, তার ওপর যদি হার্টের গন্ডগোল থাকে, তাহলে তো খুবই মুশকিল ?

ছোটমামা বললো—মুশকিল বৈকি। প্রথমেই ওজন কমাতে হবে, মেদ ঝরাতে হবে। এর জন্য দরকার একদিকে শারীরিক পরিশ্রম, অন্যদিকে খাবার তালিকা থেকে ক্যালরি'র কাটছাঁট।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে খাবে কি ?

—যদি রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে হয় তাহলে খাবার তালিকায় থাকবে মূলতঃ মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু, দই, রুটি, বেশী করে শাকসব্জি, ফলমূল, পেঁয়াজ, রসুন, একটু দুধ, মাছ-মাংস। দেখতে হবে দিনে যাতে হাজার ক্যালরির বেশী পেটে না যায়।

চিন্তিতভাবে টুম্পা বললো—আমার ওজন বাড়ছে। আমি কি ঘি আর মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে দেবো ?

ছোটমামা হাসলো।—এত কম বয়সে কিছু দরকার নেই শুধু বারবার করে টুকটাক মুখ চালাবি না। এতে হিসেব রাখা মুস্কিল কত 'ক্যালরি' শরীরে যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, পেলেই চকলেট আর আইসক্রীম খাবো, এটাও ভাল অভ্যেস না।

সত্যবাবু বললেন—-তাহলে কোন ধরণের খাবার কতটা খাবো ?

মোটামুটিভাবে খাবারের অর্ধেক থাকবে ভাত-রুটি ধরনের শ্বেতসার জাতীয় খাবার, ত্রিশভাগ প্রোটিন আর বিশভাগ স্নেহজাতীয় খাবার।

মাথা নাড়লেন সত্যবাবু।—কিছুতেই কিছু হবে না। কোলেস্টেরল একবার রক্তে বাড়লে তা আর কমে না। আর কোলেস্টেরল বাড়লে যে কোনো দিন 'হার্ট-আটাক' হবে।

টুম্পা বললো—এই কোলেস্টেরল খাবার থেকে আসছে ?

ঘড়ির দিকে তাকালো ছোটমামা।—তাহলে তো কোলেস্টেরল নিয়ে দু-চার কথা বলতে হয় ? কিন্তু এ দিকে যে রাত হয়ে যাচ্ছে ?

সত্যবাবু বললেন—তা হোক। শরীরের যে শত্রু—তার কথা একটু জেনে রাখা ভালো।

শত্রু বলছেন কেন ?—প্রতিবাদ জানালো ছোটমামা ঃ প্রতিটি কোষ গড়ার কাজে কোলেস্টেরলের ভূমিকা আছে। এটা খুব প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল। কিন্তু যতো বিপদ—রক্তে এর মাত্রা বাড়লেই। তুই যেন কি বলছিলি টুম্পা ?

—আমি জানতে চাইছিলাম এটা আসছে কোথা থেকে ? মানে....

—হ্যাঁ, আমাদের শরীরে সারাদিনে প্রায় একগ্রাম কোলেস্টেরল তৈরী হয়। এর দশ ভাগের তিনভাগ আসে খাবার থেকে, বাকি সাতভাগ তৈরী হয় শরীরের মধ্যে, অন্য রাসায়নিক অনু জুড়ে জুড়ে, মূলতঃ অন্ত্রের দেওয়ালে আর লিভারে।

টুম্পা বললো—একটা প্রশ্ন আসছে আমার মাথায়। কোলেস্টেরল হচ্ছে স্নেহজাতীয় জিনিস, ঠিক তো ?

—বিলকুল ঠিক !

—এখন রক্তের মধ্যে যদি আটানব্বইভাগ জল হয়, তাহলে তেলে-জলে মিশ খাচ্ছে কি করে ?

ছোটমামা বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল টুম্পার মুখের দিকে।

—দারুন প্রশ্ন করেছিস্ তো ? এর জন্যই তোর একটা গল্পের বই পাওয়া রইলো আমার কাছে।

টুম্পা বললো— তা তো বুঝলাম। কিন্তু উত্তরটা কি ?

তাহলে তো রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়ানো ‘স্নেহ জাতীয় পদার্থের’ কথা বলতে হয়।—উঠতে গিয়েও বসে পড়লো ছোটমামা—শুধু কোলেস্টেরলই নয়, অন্যান্য ‘ফ্যাট’ যেগুলো আছে যেমন ফসফোলিপিড মানে ফসফরাসযুক্ত স্নেহপদার্থ’, ট্রাইগ্লিসারাইডস্, কিছু কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডের কণা এদের সবার সমস্যাই কিন্তু এক। এমনিতে এরা রক্তরসে মিশতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে এরা রক্ত রসের বিশেষ কিছু প্রোটিন অনুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রক্তের স্রোতে ভেসে বেড়ায়। এই অবস্থাটার নাম ‘লাইপো-প্রোটিন কমপ্লেক্স’। লাইপো প্রোটিনদেরও আবার নানা রকম ভাগ আছে—তবে সে কথা যাকগে।

চোখ বড়ো বড়ো করে ছোটমামার কথা শুনছিলো টুম্পা। ছোটমামা থামতেই জিজ্ঞাসা করলো—আমাদের রক্তে কোলেস্টেরল থাকে কতটা ?

—এই ধর, প্রতি একশ মিলিমিটার রক্তে একশো বিশ থেকে দুশো

মিলিগ্রাম। এছাড়া ট্রাইগ্লিসারাইডের হিসেবটাও জানা ভালো কারণ রক্তে ট্রাই-গ্লিসারাইড ধরণের স্নেহ পদার্থ বেড়ে গেলেও হার্টের গণ্ডগোলের সূত্রপাত হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় এর পরিমান প্রতি একশো মিলিলিটার রক্তে পঞ্চাশ থেকে দেড়শো মিলিগ্রাম।

সত্যবাবু বললেন—এত হিসেব মনে রাখা মুশকিল।

ছোটমামা হাসলো।—কোলেস্টেরলের হিসেবটাও কি কম গণ্ডগোলের নাকি? কারো রক্তে যদি দুশো মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল পাওয়া যায়, তাহলে মনে করার কারণ নেই যে সবটাই খারাপ। এর মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ ভাগের একভাগ ভালো কোলেস্টেরল!

সত্যবাবু বললেন—কিছু বুঝলাম না।

—একটু আগে বললাম না, লাইপো প্রোটিনদের মধ্যেও আবার ভাগ আছে? এই ভাগগুলো করা হয়েছে এদের ঘনত্ব অনুসরে। 'ভারী লাইপো প্রোটিন' শরীরের পক্ষে ভালো।

আরো গুলিয়ে গেল।—টুম্পার মন্তব্য।

—লাইপো প্রোটিন মানে ফ্যাট আর প্রোটিনের মিশ্রন। তাই তো? ফ্যাট হালকা প্রোটিন ভারী। যে লাইপো প্রোটিন হালকা, তাতে ফ্যাটের ভাগ বেশী, ভারী-লাইপোপ্রোটিনে প্রোটিনের পাল্লা ভারী।

টুম্পা বললো——তাতে কি হলো?

ছোট্ট করে হাই তুললো ছোটমামা।

—কথায় বলে না, সঙ্গগুণ আর সঙ্গদোষ? ভালছেলেদের সঙ্গে মিশলে ছেলে ভালো আর খারাপদের সঙ্গে মিশে খারাপ? কোলেস্টেরলের বেলাতেও তাই। ভারী লাইপো প্রোটিনের দলে মিশে কোলেস্টেরলও ভালো হয়ে যায়। দেখা গেছে রক্তে ভারী লাইপো-প্রোটিন বাড়ালে তারা রক্ত নালীর গায়ে কোলেস্টেরল জমতে দেয় না, হার্টকেও সুস্থ্য রাখে। যত গণ্ডগোল, ঐ হালকা ফ্যাটওয়ালা লাইপো প্রোটিন বাড়লেই।

সত্যবাবু বললেন—তা তো হলো। কিন্তু 'ভারী লাইপোপ্রোটিন' বাড়ানোর কোন উপায় আছে কি?

—ঐ যে খেলাধুলোর কথা বললাম? নিয়মিত খেলাধুলো বা দৌড়ঝাপ কমলে রক্তে ভারী-লাইপো প্রোটিন বাড়ে। এরা আবার রক্তনালীর থেকে বাড়তি ফ্যাটকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে লিভারে। রক্তে ফ্যাট বেড়ে গেলে রক্ত একটু ঘন হয়ে পড়ে, রক্ত ঘন হলে লাল রক্ত কনিকারা কেমন যেন গায়ে গায়ে সেঁটে যায়। ফলে রক্তের অক্সিজেন বইবার ক্ষমতাও যায় কমে।

টুম্পা বললো—যেহেতু রক্ত কনিকারাই অক্সিজেন পিঠে করে বয়?

ঠিকই তো।—উত্তর দিলো ছোটমামা ঃ একে অপরের পিঠে পিঠ লাগিয়ে থাকলে বোঝাটা নেবে কোথায়? রক্তে যদি 'ফ্যাট' কমানো যায়, রক্ত কণিকাদের অক্সিজেন বইবার ক্ষমতা আবার যায় বেড়ে!

সেইজন্যেই যারা মোটা, তারা বেশী ছুটতে পারে না!—পাশ থেকে মন্তব্য করে গাবলু।

এটা একটা বড় কারণ নিশ্চয়!—মাথা নাড়লো ছোট মামা।

সত্যবাবু বললেন—একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। কোলেস্টেরল লাইপোপ্রোটিন না কি যেন বললে, ঐ সবই তো জন্ম থেকেই রক্ত আছে। চল্লিশ বছরের পর থেকে রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমতে থাকে কেন?

ছোটমামা হাসলো।—আপনি লাখটাকা দামের প্রশ্ন করেছেন। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কোন কারণে যদি রক্তে কোলেস্টেরল আর অন্য একধরণের স্নেহপদার্থ, এসফোলিপিডের অনুপান স্বাভাবিকের তুলনায় পাল্টে যায়, কিংবা রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস্ বা ফ্যাটি অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে থাকে—তাহলেও 'অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস' মানে রক্তনালীতে চর্বি জমার সূত্রপাত হতে পারে।

টুম্পা বললো—কারণগুলো কি কি হতে পারে?

—হাজার একটা কারণে রক্তে ফ্যাট কিংবা লাইপো-প্রোটিন বেড়ে যেতে পারে। যেমন ধরু, মানসিক অশান্তি, বেশী সিগারেট বা কফি খাওয়ার ব্যাপারে বেশী লোভ—এগুলো সবই লিভারে 'হালকা-লাইপোপ্রোটিন' তৈরী বাড়িয়ে দেয়। সাথে সথে রক্তে বাড়ায় ফ্যাটি-অ্যাসিড আর কোলেস্টেরলের মাত্রা।

সত্যবাবু বললেন—এগুলো কি পরীক্ষিত সত্য?

ছোটমামা আবার একটা হাই তুললো।—খরগোস, বাঁদর, শুয়োর, মানুষ এদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সব কথা বলেছেন। তবে বাদ বেড়াল, কুকুর আর ইঁদুর। অনেক চেষ্টা করেও এদের রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমা করা যায় নি। বিজ্ঞানীরা এই রহস্যটা উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। জানা গেলে তা হয়তো আমাদের বিরাট উপকারে আসবে।

কিন্তু আজ আর না, এবার উঠতে হবে।

টুম্পা বললো—তাহলে বোঝা যাচ্ছে রক্তে যদি 'হালকা-লাইপোপ্রোটিন' কমানো যায়, সেটাই হবে মস্ত লাভ!

ছোটমামা বললো—ঠিক। তবে 'হালকা লাইপোপ্রোটিন' কমানোর সবথেকে সহজ উপায় হলো খাওয়াদাওয়ার ওপর নজর দেওয়া। সকলে বলে, চল্লিশের

পর থেকে খাওয়া কমাও—রক্তের কোলেস্টেরলের দিকে নজর দাও। এটা ঠিক না। অসুখটার সূত্রপাত হয় অন্ততঃ আরো দশটা বছর আগে। সুতরাং ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকেই রক্তের কোলেস্টেরলের দিকে নজর দেওয়া দরকার-অন্তত বছরে একবার মাপিয়ে নেওয়া ভাল।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে তো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে?

—সে তো নিশ্চয়। সব কিছুই খাওয়া যায় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে 'ক্যালরি'র দিকে। এছাড়া আগেই বলেছি 'সূর্যমুখী' বা 'সয়াবিনের' তেল রক্তে কোলেস্টেরল কমায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সব তেলে 'লিনোলিক অ্যাসিড' বলে একধরণের ফ্যাটিঅ্যাসিডের মাত্রা বেশী, তারাই রক্তে কোলেস্টেরল কমায়। অনেকে মনে করেন এরা কোলেস্টেরলকে ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করে।

সত্যবাবু বললেন—আর কোন উপায় আছে না কি কোলেস্টেরল কমাবার?

—নিশ্চয় আছে। শাক-পাতা বেশী খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে না। শাক-পাতার মধ্যে কোলেস্টেরল গোত্রের কিছু জিনিস থাকে, যাদের নাম 'সিটোস্টেরল'। খাবারে সিটোস্টেরল থাকলে কোলেস্টেরল অন্ত্র থেকে শোষিত হয় কম। আর যদি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব বেড়ে যায়, তাকে কমানোর জন্য ওষুধ পত্র-ও আছে।

সত্যবাবু বললেন—ওষুধ দিয়ে কোলেস্টেরল কমে?

—নিশ্চয় কমে। আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল থেকে তৈরী হয় পিত্তের অ্যাসিড, আর খানিকটা কোলেস্টেরল পরিবর্তিত হয়ে মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। পিত্তের ব্যাপারটা আবার বেশ মজার! লিভার থেকে বেরিয়ে তা গিয়ে পড়ে অন্ত্রে, যেখানে পিত্ত স্নেহজাতীয় খাবার হজমে সাহায্যে করে, তারপর আবার অন্ত্র থেকে অনেকটা অংশই শোষিত হয়ে ফিরে আসে লিভারে। আজ বরং উঠি রে!

টুম্পা বললো—শুনতে বেশ ভালো লাগছে। আর একটু বসো না। ওষুধ দিয়ে কিভাবে কোলেস্টেরল কমানো যায় বললে না তো?

সত্যবাবু হাসলেন।—দেরী করে আসার খেসারত!

হতাশভাবে ঘড়ির দিকে তাকালো ছোটমামা!—সংক্ষেপে বলছি। 'কোলেস্টেরামাইন' বা 'অ্যাট্রোমিড এস' ধরনের কিছু ওষুধ আছে যারা অন্ত্র থেকে পিত্তের-অ্যাসিড শোষণে বাধা দেয়, আবার কোলেস্টেরলকে বেশী পরিমাণে ভেঙে 'পিত্ত-অ্যাসিড' তৈরী করায়। শুধু তাই নয়, এরা লিভারে 'হালকা-লাইপোপ্রোটিন' তৈরীর হারও কমিয়ে দেয়। ফলটা বুঝতেই পারছিস, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমবে। তবে ওষুধবিসুধ খাওয়ার হাঙ্গামা অনেক,

কিছু না কিছু বাড়তি উপসর্গ জুটে যাবেই ! সুতরাং কোলেস্টেরল কমানোর ব্যাপারে ওষুধ ডাক্তারদের শেষ হাতিয়ার। নিজে চেষ্টা করে যদি কোলেস্টেরল না কমে, তখন ওষুধের কথা ভাবা যেতে পারে। অসুখ হলে তবেই ওষুধ—অন্যথায় সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কি লাভ ?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার উঠে পড়লো ছোটমামা। এত রাত্রে বাস কিংবা ট্যাক্সি পাওয়া মুসকিল। বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে মনে হচ্ছে।

গাবলু-টুম্পা একসাথে বলে উঠলো—কোলেস্টেরল কমানোর সবথেকে সহজ উপায় হচ্ছে হাঁটা। একটু পা চালিয়ে হাঁটো। টা টা ছোটমামা শুভরাত্রি !

নির্দেশ পঞ্জী

Berne, R. M. : Regulation of Coronary Blood Flow, Physiological Review, 44 (1964).

Best, C. H. & N. B. Taylor : The Physiological Basis of Medical Practice, 8th Edition, Wiliams & Wilkins (1966).

Carlsten, M. & J. Grimby. : The Circulatory Responses to Muscular Exercise in man, Thomas (1966).

Chakraborty, S. & B. B. Nath : Thrombosis and its cure, Science Reporter, April (1980).

Chakraborty, P. : Hypertension—the silent killer, Science Reporter, May (1982).

Ganong, W. F. : Review of Medical Physiology, 6th Edition, Lange Medical Publication (1973).

Garg, A. N. & S. L. Sharma. : Cholesterol—a cause for concern, Science Reporter, November (1979).

Goldman, M. J. : Principles of Clinical Electrophysiology, 8th Edition, Lange Medical Publications (1973).

Gordon, M. S. : Animal function : Principles & Adaptations, Amerind (1971).

Grady, D. : Replacing the Heart, Discover, February (1983).

Guyton, A. C. : Textbook of Medical Physiology, 4th Edition Saunders (1971).

Gregg, D. E. : Physiology of Coronary Circulation, Annals of New York Academy of Science 90 (1960).

Hamilton, W. F. & P. Dow. : Handbook of Physiology, section 2, volume 3, American Physiological Society (1965).

Keele, C. A. & E. Neil. : Samson Wright's Applied Physiology, 12th Edition, Oxford University Press (1971).

Sergeev, B. : Physiology for Everyone, Mir Publishers (1973).

Yudenich, V. V. : Accident First Aid, Mir Publishers (1982).

West, E. S. & W. R. Todd. : Text book of Biochemistry, 3rd Edition, MacMillan (1963).